সৈনিক বাঙালী

[১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে ফ্রান্স, মেসোপোটেমিয়া
ও কুর্দ্দিস্তানে বাঙালী পল্টন]

সুবেদার এম. বি. সিংহ
প্রণীত

প্রকাশক—

সুবেদার এম, বি, সিংহ

১ডি, প্রিয় ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীট,

পোঃ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—অক্টোবর ১৯৩৯

দ্বিতীয় সংস্করণ—জুন ১৯৪০

প্রাপ্তিস্থান—

মুখার্জ্জী প্রেস

৫এ, নূরমহম্মদ লেন, কলিকাতা

১ডি, প্রিয়নাথ ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ও

কলিকাতার সকল পুস্তকালয়।

প্রিণ্টার—

শ্রীমণীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

মুখার্জ্জী প্রেস

৫এ, নূরমহম্মদ লেন,

কলিকাতা।

যিনি নীরবে দেশের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন এবং বাঙালী জাতির মধ্যে প্রকৃত সৈনিকের স্বরূপ দেখিতে চাহেন, বাংলামায়ের সেই কৃতি সন্তান, সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় সার এন. এন, সরকার, কে, সি, এস, আই, মহাশয়ের শুভ আশীর্ব্বাদে 'সৈনিক বাঙালী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

—গ্রন্থকার।
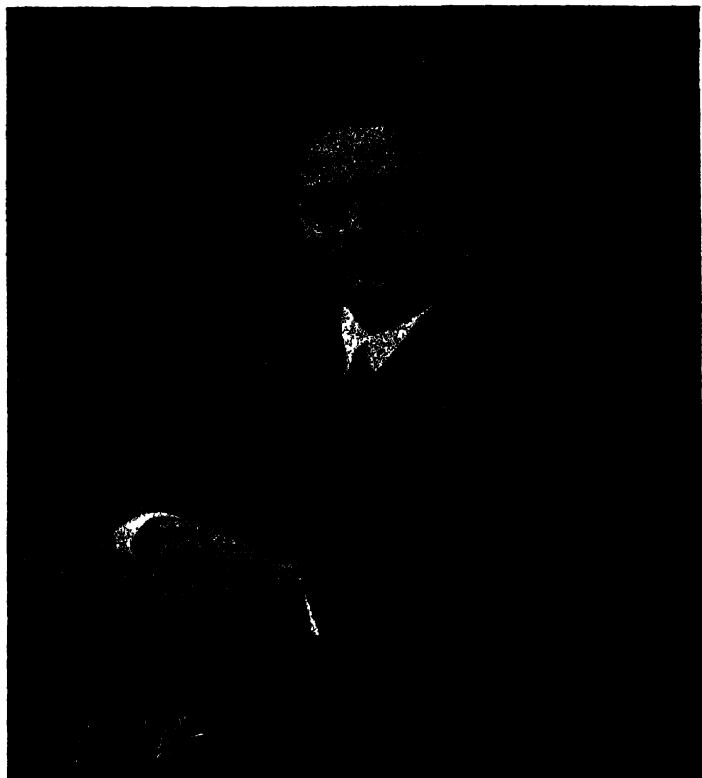
Sir N. N. Sircar, K. C. S. I.,
Ex-Law Member of Viceroy's Council and
Ex-Advocate General of Bengal.

38-1, ELGIN ROAD,
CALCUTTA.

28. 6. 40.

My dear Mr. Singh,

I wish all success, and very wide ~~app...~~ publication of your revised edition of সৈনিক বাঙ্গালী. The facts set out in the book, should be known to the people of Bengal, as I am sure that they will serve as an inspiration during the present eventful times.

Yours sincerely

N. N. Sircar.

(Sir N. N. Sircar, K. C. S. I.,
Ex-Law Member of Viceroy's Council and
Ex-Advocate General of Bengal.)

the defence of our hearth and home should forthwith and primarily be our own concern.

Subedar Singh is a pioneer who has spared no pains and efforts in providing us with a very timely and readable publication which, as I have already stated, should be widely read by our boys and girls. I also do hope that his example will be followed by other competent Bengalees who will provide similar small and interesting brochures and text books in Bengal on the several arms of modern warfare and that they will have a wide circulation.

A few Battalions of Bengalees on a permanent territorial basis, also a few mechanised units on the same footing and a training college for pilots and officers in all the Arms of Defence must forthwith mature. And old man's dream must be turned into reality, sooner rather than later.

Swaraj may wait but defence of India should not.

15, Camac Street,
Calcutta.
14th June 1940.

K. K. Chatterjee,
Lt. Col. I. T. F.
Hony. Colonel, C. U. T. C.

18, Canal Street,
Calcutta,
The 24th June, 1940.

Sir Abdul Halim Ghuznavi thanks Subedar M. B. Singh for a copy of his book entitled "Sainik Bangali" which he has been good enough to present him. The book is interesting and useful and proves beyond doubt that Bengalees yield to none in martial qualities and spirit.

Sd/ A. H. Ghuznavi,
Sir Abdul Halim Ghuznavi, M. L. A.
(Central)

Subedar M. B. Singh
1D, Preonath Banerjee Street,
Calcutta.

BUCKINGHAM PALACE.

1918.

The Queen & I wish you God-speed, a safe return to the happiness & joy of home life with an early restoration to health.

A grateful Mother Country thanks you for faithful services.

George R. I.

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে ওয়ার প্রিজ নার্সদের নিকট মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের স্বহস্ত লিখিত বাণী।

(ভোলানাথ মুখার্জ্জির সৌজন্যে প্রাপ্ত)
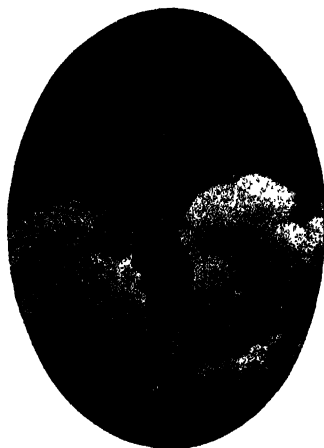
উৎসর্গ—

যিনি শতাব্দীর জড়তা ভাঙাইয়া বাঙালী-সন্তানকে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, যাঁহার কৃপায় বাঙালী সন্তান ইউরোপীয় মহাসমরে যোগ দিতে প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিল, বাঙালী জাতির সেই অকৃত্রিম বন্ধু ডাঃ শরৎকুমার মল্লিকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এবং

বাঙালী বীর সন্তান যাহারা বাঙালীর সম্মান রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হইল।

ডাক্তার এস, কে, মল্লিক

(কলিকাতা মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, স্কুল ও হস্‌পিটালের সৌজন্যে)

ভূমিকা

১৯১৪! নাইনটীন ফোরটীন! পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা চিরস্মরণীয় বৎসর। যে ইউরোপের ইতিহাস প্রধানত কেবল যুদ্ধেরই ইতিহাস, যে ইউরোপ বিজ্ঞানকে যুদ্ধের কাজে লাগাইয়া যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে পরিণত করিয়াছে, যে ইউরোপ পাথর হইতে আরম্ভ করিয়া অভিব্যক্তির ধারা অনুসবণ করিয়া বিষাক্ত গ্যাস্‌কে মারণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে সেই ইউরোপও ১৯১৪-এর নামে আজিও কম্পিত হয়!

সেই ১৯১৪-এর মহাযুদ্ধে ভীরু অপবাদগ্রস্ত গৃহাশ্রয়ী ৭০০০ হাজার বাঙালী ঘরের মায়া কাটাইয়া যোগ দিতে ছুটিয়াছিল· ইহাও বাঙালী জাতির ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা! চিরস্মরণীয় এই জন্য যে বাঙালী বহুকাল দুঃসাহসিক কোন কাজ করিবার সুযোগ পায় নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে যুদ্ধের সুযোগ তাহার ভাগ্যে কখনও লাভ হয় নাই। ইউরোপের আধুনিকতম সংস্কৃতি যে জাতি অতি সহজেই আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছে সে জাতি ইউরোপের দৈহিক এবং মানসিক বীর্য্যকে আত্মস্থ করিবার কোন চেষ্টাই এতকাল করে নাই। মনে হয় সেই জন্যই মনে মনে তাহার একটা লজ্জা ছিল, ক্ষোভ ছিল, হয়ত তাহার মনে হইয়াছিল যে সুযোগ পাইলে সে নিজেকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। তাই যেদিন সে সুযোগ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার মিলিল সেদিন সে ঘরের মায়া কাটাইয়া নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না।

বাঙালী সেদিন তাহার সমস্ত সংস্কার যে এক নিমেষেই কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল তাহার একমাত্র কারণ ইহাই। কিন্তু এই যুদ্ধে তাহার যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে—দুঃখ এই যে, সেই অভিজ্ঞতা তাহার পরবর্ত্তী কালের মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিবার কোন সুযোগই সে এ পর্য্যন্ত পায় নাই। যে জিনিযের পৌনঃপুনিক অভ্যাসে বা আলোচনায় সেই জিনিষ জাতির সম্পদ হইয়া দাঁড়ায়—সেই দুর্লভ জিনিষ আকস্মিকভাবে বাঙালীর কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত তেমনি আকস্মিকভাবেই চলিয়া যাইতে বসিয়াছে। একমাত্র স্মৃতি রহিয়াছে কলেজ স্কোয়ারের স্মারকশিলা—মৃত বাঙালী সৈনিকের নাম বহন করিয়া। কিন্তু এইখানেই কি বাঙালী পল্টনের কাহিনী শেষ হইয়া যাইবে? জাতীয় জীবনের এত বড় একটি ঘটনা, তাহার কোন ইতিহাস লেখা হইবে না?

বাঙালী মহাযুদ্ধে যেটুকু করিবার সুযোগ পাইয়াছে, মহাযুদ্ধে ইউরোপীয় সৈন্যের কৃতিত্বের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙালীর অকিঞ্চিৎকর জীবন-ইতিহাসে তাহা মোটেই তুচ্ছ নহে। উপযুক্ত সুযোগ পাইলে বাঙালী সৈনিক সেদিন ইউরোপীয় কোন সৈনিক অপেক্ষাই কম কৃতিত্বের পরিচয় দিত না, কেননা মরিতেই ত সে গিয়াছিল! যেটুকু সুযোগ তাহার হইয়াছিল তাহারই মধ্যে সে তাহার উপযুক্ততা চরম ভাবেই প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের মহাকায় বহু ইতিহাস রচিত হইলেও বাঙালী পল্টনের ইতিহাস আজিও লেখা হয় নাই। যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ধীরে ধীরে বাঙালী জাতির মধ্যে যুদ্ধের ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিতে পারে সেই জিনিষের স্থায়ী ইতিহাস রচিত হওয়া প্রয়োজন কিন্তু বাঙালী পল্টনের ইতিহাস রচনা আমার একার সাধ্যায়ত্ত

লেখক।
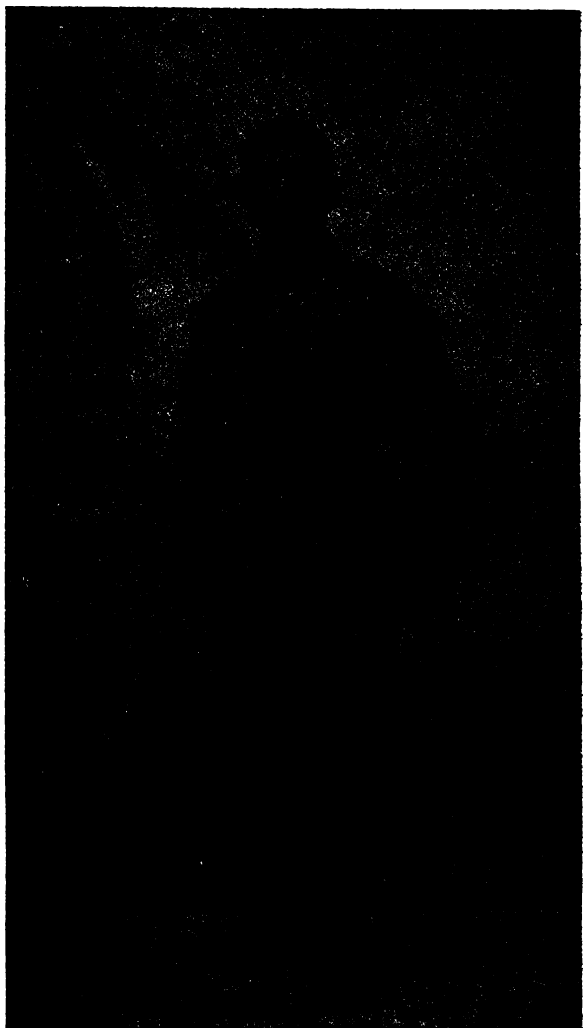
নহে। সুতরাং সে চেষ্টা করিব না। আমার একার চেষ্টায় যতটুকু সম্ভব তাহাই আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহা ইতিহাস নহে, ইহা আমার সৈনিক জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বাঙালীর সৈনিক জীবনের রেকর্ড হিসাবে ইহার কিছুমাত্র মূল্য স্বীকৃত হইলেও আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে কিছু কিছু সংবাদ এবং তথ্য, কাহিনীর আনুষঙ্গিক হিসাবে দিয়াছি। সুতরাং তথ্যের দিক দিযা পাঠকের কিছু অন্তত লাভ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাহা ছাড়া বাঙালী সৈনিকদের সম্বন্ধে অনেকের মনে প্রকৃত কোন ধারণা না থাকায় অনেক কাল্পনিক ধারণা স্থান পাইয়া থাকিবে। যেমন অনেকে বলিয়া থাকেন বেঙ্গলী ডাবল কম্পানিকে করাচী হইতে ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া অনেক বাঙালীর মুখে শুনিতে পাইয়া থাকি যে ৪৯ সংখ্যক বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভাল কাজ করিতে পারে নাই বলিয়া বন্দুক কাড়িয়া লইয়া কোদাল ও ঝুড়ি তাহাদের হাতে দিয়া রাস্তা তৈরী করানো হইয়াছিল। আর একটি গল্প শুনিতে পাওয়া যায় বাঙালী সৈন্যরা শত্রুদের সহিত সম্মুখে যুদ্ধ করিয়া শত শত জার্ম্মাণদের বুকে বেয়নেট্ বসাইয়াছিল। এই সকল গল্পের মধ্যে কোনটাই সত্যি নয়। তাহাও এই কাহিনী পাঠ করিলে দূর হইবার সম্ভাবনা।

আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা যাঁহাদের উৎসাহে এবং সাহায্যে ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে সুবেদার হীরেন্দ্রনাথ সরকার, জমাদার প্রকৃতিকুমার ঘোষ, জমাদার প্রতাপচন্দ্র রায়, সুবেদার ধীরেন্দ্রকুমার সেন, জমাদার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, জমাদার গোষ্ঠবিহারী ঘোষ, হাবিলদার মোহিতকুমার মুন্সী, মিঃ অনিল মিত্র, মিঃ রাম ব্যানার্জ্জী, মিঃ প্রসাদদাস ব্যানার্জ্জী, মিঃ সুরথ মিত্র, মিঃ কালিপদ সরকার, মিঃ

অমিয় হালদার, মিঃ চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী, (এক্স সোল্‌জার্স) মিঃ ভোলানাথ মুখার্জ্জী, মিঃ এ হায়াৎ (বেঙ্গল এ্যাম্বুলেন্স কোর) মিঃ পি, কে, মিত্র, বি, এল্, এটর্ণি-এট্-ল, শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি।

এই গ্রন্থের ভাষা আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এম্, বি, সিংহ,

(সুবেদার, ফর্টিনাইন্থ বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট)

বাঙ্গালী পল্টন

গত মহাযুদ্ধের সময় উনপঞ্চাশত্তম বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে জ্ঞাতব্য নানা তথ্য "সৈনিক বাঙালী" নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। তাহার পরিচয় অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও বাঙালী পল্টন গড়িবার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা সফল হওয়া উচিত। এখানে আমরা হিংসা অহিংসার কথা আলোচনা করিব না। আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি এই দেশে সৈন্যদল থাকা আবশ্যক হয়—বাস্তবিক দেখিতেছি সৈন্যদল আছে ও তাহার কাজও আছে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতে, সুতরাং বাংলা দেশ হইতেও, সৈন্য সংগৃহীত হওয়া উচিত। যুদ্ধ শিক্ষায় কতকগুলি উপকার হয়, সেগুলির বাঙালীর বিশেষ আবশ্যক। যুদ্ধ শিখিলে দেহ সুস্থ সবল ও দৃঢ় হয়। বাঙালীর তাহা চাই। যুদ্ধ দলবদ্ধতা, দলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, নিয়মানুগত্য এবং ক্ষিপ্রকারিতা শিক্ষা দেয়। বাঙালীর এই শিক্ষা দরকার। মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবং সকল অবস্থায় নির্ভয় থাকা সৈনিকের লক্ষণ। **সৈনিক অসৈনিক সকল বাঙালীর এই সৈনিক-ধর্ম্ম-লাভ বাঞ্ছনীয়।**

বাঙালী যে দক্ষ কর্ম্মঠ ও সাহসী সৈনিক হইতে পারে, তাহা শুধু সুদূর অতীত ইতিহাস দ্বারা নহে, গত মহাযুদ্ধেও প্রমাণিত হইয়াছে তাহাতে অনেক বাঙালী সিপাহী ও অফিসার প্রশংসিত ও পদে-উন্নীত হইয়াছিল। "সৈনিক বাঙালী" বহিটির নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে বাঙালী পল্টন যে গঠিত হইতে পারে ও হওয়া উচিত, তাহা বুঝা যায়।

(১) ভারতীয় সমরবিভাগ বাঙালীকে ভারতীয় পল্টনের মধ্যে একটী স্থান দিয়েছিল।

(২) পল্টনের বিশেষ নাম-করণ হয়েছিল।

(৩) সুদক্ষ সামরিক শিক্ষক বাঙালীকে সামরিক শিক্ষা দিয়েছিল ।

(৪) বাঙালীকে সুদূর মেসোপটেমিয়া ও কুর্দ্দিস্থান যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হয়েছিল।

(৫) ভারতবর্ষে, মেসোপটেমিয়ায় এবং কুর্দ্দিস্থানে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ জেনারেল-গণ সকলেই বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট পরিদর্শন করে বিশেষ সুখ্যাতি করেছিলেন।

(৬) যুদ্ধশেষে ভারতসম্রাট বাঙালীকে শান্তি-উৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

(৭) বাঙালী রেজিমেণ্টের জন্য করাচী ডিপো, দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট এবং মেসোপটেমিয়া ও কুর্দ্দিস্থানের সমর-বিভাগ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন।

(৮) প্রতিবৎসর ১১ই নভেম্বর সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা দুর্গ থেকে একটি বন্দুকধারী সৈন্যদলকে কলেজ স্কোয়ারে মৃত বাঙালী সৈনিকদের সম্মান রক্ষার্থ পাঠিয়ে থাকেন।

শান্তির সময়েও মজুদ সৈন্যদল ("standing army") সকল দেশেই আছে। ভারতবর্ষেও আছে। এই স্থায়ী সেনাদলের কাজ আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষা, এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা।

যুদ্ধ বাধিলে দরকার মত নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেনাদলকে বৃহত্তর করা হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় এই প্রকারে নূতন ৪৯তম বাঙালী পল্টন (49th Bengali Regiment) গঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে নবসংগৃহীত সৈন্যদিগকে বিদায় দেওয়া হয়, স্থায়ী সৈন্যদল আগে যেরূপ ছিল, সেইরূপই থাকে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষের স্থায়ী সৈন্যদলে বাঙালী পল্টন থাকা উচিত। স্থায়ী সৈন্যদলে পাঞ্জাবী গুর্খা প্রভৃতিই থাকিবে, এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম নাই; ভারতবর্ষের সব অংশের লোক ভারতীয় সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থ ট্যাক্স দিয়া থাকে—বিশেষতঃ বাংলা ত খুবই দেয়, সুতরাং সব অংশের লোকেরই সৈন্য হইবার অধিকার আছে—স্থায়ী সৈন্যদলে থাকিবার অধিকার আছে। পাঠান, শিখ, গুর্খা প্রভৃতি সিপাহীরা যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ করে, তাহা নহে; কখন কখন যুদ্ধ করে, কখন বা বসিয়া বসিয়া বেতন ভোগ করে—অধিকাংশ সময় বেতন ভোগই করে, যুদ্ধ ও বেতন ভোগ এই উভয় কার্য্যই বাঙালী সিপাহীরা করিতে সমর্থ।

"পৃথিবীতে সব সময়ে যুদ্ধ হয় না। কিন্তু তবুও প্রত্যেক দেশেই সৈন্য প্রয়োজন। এমন সৈন্য আছে যারা আজীবন শান্তি ভোগ করেছে এবং পেন্‌শনও ভোগ করেছে কিন্তু জীবনে কখনও যুদ্ধ করেনি অর্থাৎ যুদ্ধ করবার সুযোগ পায় নি।…তবে যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। জীবিকার্জ্জন হিসাবে এবং সহজভাবে সৈনিকজীবনকে গ্রহণ করলেই সব সমস্যার সহজ মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। বহু লোকের জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা এতে হয়, সেদিক দিয়েও এটা ভাবা উচিত, এবং সুযোগ পেলেই তা গ্রহণ করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ।" "(সৈনিক বাঙালী)।"

সৈনিক বৃত্তির এই আর্থিক দিক্‌টা আমরা সকল সময়ে মনে রাখি না। পেশাদার সৈনিক হইয়া প্রতি বৎসর পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতির লোকেরা অনেক কোটি টাকা পায়। সেই জন্য সেই সকল অঞ্চলে বেকার সমস্যা বঙ্গের মত সঙ্গীন নহে। গত মহাযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ হইতে যে সাত হাজারের উপর সৈনিক লওয়া হইয়াছিল তাহারা যদি সৈনিকই থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহারা ন্যূনকল্পে মাসিক এগার টাকা বেতন হিসাবে বাৎসরিক মোট ৯,২৪,০০০ টাকা এবং গত কুড়ি বৎসরে এক কোটি চুরাশি লক্ষ আশি হাজার টাকা পাইত। বস্তুতঃ পাইত ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী; কারণ, সকলেই ভাতা পাইতে পারিত এবং দেশী অফিসারের পদে উন্নীত সুবেদার প্রভৃতিরা অধিক বেতন পাইত।

অনেকের কৌতুহল হইতে পারে যে, বাঙালী পল্টনের সৈনিকদের যোগ্যতা সত্ত্বেও তাহাদিগকে স্থায়ী সৈন্যদলভুক্ত করিয়া কেন রাখা হয় নাই। এ বিষয়ে "সৈনিক বাঙালী" পুস্তকের লেখক সুবেদার মন বাহাদুর সিংহ লিখিয়াছেন ঃ

"আমি এক সময়ে আমাদের কমাণ্ডিং অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাঙালীকে 'রেগুলার আর্মি'তে রাখা হবে কি না। তিনি সে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই রাখা হবে যদি তারা চায়। কিন্তু বাঙালী তখন চায় নি—এর জন্যে অবশ্য নেতাদের উদাসীনতা অনেকখানি দায়ী। কয়েকজন ভারতীয় (বাঙালী) অফিসার এ বিষয়ে নেতাদের কাছে কিন্তু দরবারও করেছিলেন—কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন—যুদ্ধই যখন থেমে গিয়েছে তখন পল্টনের আর দরকার নেই। বাঙালী রেজিমেণ্ট গড়ে তুলতে হলে ডাক্তার এস, কে, (শরৎকুমার) মল্লিকের মত উৎসাহী নেতা প্রয়োজন। আশা রইল

একদিন আমার জীবিতাবস্থাতেই আবার বাঙালী রেজিমেণ্ট দেখে যেতে পারবো।”

ব্রিটিশ জাতি এখন কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতেছে তাহার বিচার না করিয়া ভারতবর্ষের সেই সকল প্রদেশেরও লোকদের সৈন্যদলে ঢুকিবার চেষ্টা করা ও ঢোকা উচিত যাহারা এখন সৈন্যদলে স্থান পায় না। তাহাদের নিজেদের ও নিজ নিজ প্রদেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহা করা আবশ্যক, এবং ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার নিমিত্ত ইহা করা উচিত। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বৈদেশিক, সামরিক ও ভারতীয় নীতি যাহাই হউক না কেন, সেই নীতি-নির্বিশেষে হাজার হাজার ভারতীয় নানা রকম সরকারী চাকরী করিয়া থাকে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারী আদর্শ ও সামরিক নীতির কথা তুলিয়া সৈনিকের চাকরী করিতে আপত্তি হওয়া উচিত নহে। প্রাণের ভয়টা আছে বটে; কিন্তু সব সৈন্য যুদ্ধ করে না, যাহারা করে তাহারা সকলে মরে না। এবং সৈনিক না হইলেই যে মানুষ অমর বা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে তাহা নহে।

প্রশ্ন উঠিবে, বাঙালীদের মধ্যে কাহারা সৈনিক হইবে? এ বিষয়ে "সৈনিক বাঙালী" বহির লেখক বলেন :—

"বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী [গত] মহাযুদ্ধে গিয়েছিল একটা ভাবাদর্শে, একথা ঠিক। কিন্তু বাঙালীকে নিয়ে স্থায়ী সেনাদল গঠন করতে হ'লে বাঙালীর মধ্যে এমন কোন কোন সম্প্রদায় আছে যাদের দিকে দৃষ্টি দিলে একাজ সহজে হতে পারে। নমঃশূদ্র এবং রাজবংশী বাঙালীদের মধ্যে সেনা হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। [বাগদী প্রভৃতি জাতিও উপযুক্ত।—প্রবাসীর সম্পাদক।] মুসলমানদের মধ্যেও কোন কোন শ্রেণী উপযুক্ত। স্থায়ী সেনাদল ভবিষ্যতে এদের দ্বারাই গঠিত হবে আমার বিশ্বাস।

তবে মেকানাইজড আর্মির জন্য হয় ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীকেই নিতে হবে।”

সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন বেকার-সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হইতে পারে, এ আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। বেকার লোক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীতেই কেবল আছে এমন নয়। সকল শ্রেণীতেই আছে।

আমরা ভুলিয়া যাই নাই যে, বাঙালী প্রভৃতি বর্ত্তমানে অযোদ্ধা জাতি সিপাহী হইতে চাহিলে যোদ্ধা জাতিদের আপত্তি ও বিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী; কারণ, তাহাতে তাহাদের যুদ্ধব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে বেকার অনেককে হইতে হইবে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে আগে প্রধানতঃ কোন কোন প্রদেশের কোন কোন শ্রেণীর লোকই মসীজীবী (কেরানী) এবং বক্তৃতা-জীবী (উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টর শিক্ষক অধ্যাপক) হইত। তাহাদের অসুবিধা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রদেশের ও শ্রেণীর লোকেরা ঐ সকল বৃত্তি ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় অবলম্বন করিতেছে। তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা বা বন্ধ করা হইতেছে না। সৈনিক বৃত্তির বেলাই কেন বাধা দেওয়া হইবে?

সৈনিক বৃত্তির সাধারণ সমালোচনা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

বহু সভ্য দেশের শান্তিকামী ব্যক্তিরা ("pacifists") হিংসাত্মক বলিয়া সৈনিক বৃত্তির সমালোচনা ত করিয়াই থাকেন। অধিকন্তু তাঁহারা বলেন, সমগ্র পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক কেবল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকে, ইহাতে মানব সমাজের প্রভূত ক্ষতি হয়। তাহারা কৃষক ও পণ্যশিল্পী হইলে মানুষের আহার্য্য ও অন্যবিধ কত আবশ্যক সামগ্রী উৎপন্ন করিতে পারিত এবং তাহার দ্বারা সমাজের অভাব দূর হইয়া উপকার হইত। তাহারা শিক্ষাদাতা ও নানা উপায়ে চিত্তবিনোদক হইলে মানুষের কল্যাণ ও আনন্দ হইত।

ইহা সত্য কথা। কিন্তু কতক দেশের কতক মানুষ প্রভুত্বলিপ্সা ও হিংসার দ্বারা চালিত হইলে অন্য দেশের লোকদিগকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে হয়। মানবসভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা অনিবার্য্য।

অহিংসা দ্বারা ও প্রেমের দ্বারা প্রভুত্বলিপ্সু হিংস্র লোকদের হৃদয় পরিবর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ, স্থায়ী ও প্রকৃত প্রতিকার, ইহা স্বীকার্য্য। এই উপায়ে বিশ্বাসবান লোকদের ইহাই অবলম্বনীয়। অবশ্য ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভীরু ও হিংসায় অসমর্থ লোকদের অহিংসা, অহিংসা নামের অযোগ্য। **যাহারা সাহসী ও হিংসা করিতে সমর্থ, তাহাদের অহিংসাই প্রকৃত অহিংসা।**

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সাল।

পরম কল্যাণবরেষু—

সুবেদার মন্-বাহাদুর! তোমার "সৈনিক বাঙালী" অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পড়িলাম। এই সুন্দর বইখানি যে তোমার লেখা, ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দের বিষয়। বাঙ্গালী তাহার নিজের গৌরব-গাথা রচনায় বিমুখ বলিয়াই বিশ্বের সভায় তাহার এমন দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বাঙ্গালীও যে ভারতের অন্যান্য বীরজাতির ন্যায় খাঁটি সামরিক জাতি এই কথাটী অ-বাঙ্গালী দূরে থাক্, বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করানোই কিছুকাল পূর্ব্বে অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। এই কারণেই আজ প্রায় ১৮।১৯ বৎসর পূর্ব্বে আমি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া "বাঙ্গালীর বল" রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তুমি সে পুস্তক দেখিয়াছ কিনা বলিতে পারি না। সম্প্রতি উহার আর একটী নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী রচনা করিয়া তুমি আমার দেশকে যে বস্তু দান করিলে, বাঙ্গালী তাহা মাথায় করিয়া রাখিবে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন —"বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি।" সেই আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাগ্রত সচেতন করিবার জন্য তোমার "সৈনিক বাঙালী" যে নিরন্তর ভেরীনাদ করিবে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই এবং নিশ্চয়ই এমন একদিন আসিবে—হয়ত সেই শুভদিনের অরুণরাগ দূর গগনে এখনই একটু ঝিকি-মিকি করিতেছে—যখন বীর বাঙ্গালী কুর্দ্দিস্থানে বাঙ্গালীর অধুনা বিস্মৃত শৌর্য্যবীর্য্যের সন্ধান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিবে। আমার মন বলিতেছে, সেদিন বাঙ্গলার ঘরে ঘরে তোমার "সৈনিক বাঙালীর" নিমন্ত্রণ হইবে এবং সে-ও তাহার মর্ম্মস্পর্শী সরল সতেজ ভাষায় এই "আধ-মরা" বাঙ্গালীজাতিকে শুনাইবে—কেমন করিয়া সে হেলায় দুস্তর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়াছিল—একতিল বিশ্রামের জন্যও দাঁড়ায় নাই সে,—"খচ্চরের লেজ ধ'রে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তেই" একটু ঘুমিয়ে নিয়েছে—আর পাগুলি তাদের যন্ত্রের মত তালে তালে এগিয়ে গিয়েছে সেদিন। তোমার "সৈনিক বাঙালী" সেদিন তাহার স্বদেশবাসীকে বিশ্বাস না করাইয়া ছাড়িবে না যে, পৃথিবীর যে-কোন বীরজাতির সমকক্ষ তাহারা—প্রয়োজন হইলে কোন ক্লেশকেই ক্লেশ বলিয়া স্বীকার করে না—মরুরবুকে কণ্ঠতালু শুকাইয়া কাঠ হইলেও "ভেজামাটি হাতে তুলে চুষ্‌তে চুষ্‌তে" ও তাহারা সৈনিকজীবনের কর্ত্তব্যপালন করে—হা হতোস্মি করিতে করিতে মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়ে না!

আমি "বাঙ্গালীর বলের" একস্থানে লিখিয়াছিলাম—"যদিও বাঙ্গালী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সামরিক ব্যাপারে লিপ্ত হইবার সুবিধা পায় নাই,

কিন্তু তাই বলিয়া সে হৃদয় হারায় নাই—হৃদয়ে যে শক্তি থাকিলে মানুষ সমর-ক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হয়—বাঙ্গালীর হৃদয়ের সে শক্তি নানাভাবে, নানাদিকে, নানাস্থানে আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছে।" (বাঙ্গালীর বল ২য় সংস্করণ ৪১৯ পৃষ্ঠা)।

তোমার "সৈনিক বাঙালী" পড়িয়া আজ আমার সেই কথাই বার বার মনে হইতেছে - মনে হইতেছে বাঙ্গালী এইরূপই বটে। নতুবা উত্তরবঙ্গের পুনর্ভবাতীর হইতে সদর্পে রণযাত্রা করিয়া কিরূপে সে একদিন দেশের পর দেশ জয় করিয়াছিল এবং কেমন করিয়াই বা "রেবাজনক বিন্ধ্যগিরি হইতে গৌরিজনক হিমালয় এবং বালারুণ কিরণোজ্জ্বল পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে অস্তাবলম্বী ক্লান্ত রবির রক্তরাগরঞ্জিত পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগ ·····জয় করিয়া সে "করপ্রদ" করিতে সমর্থ হইয়াছিল।" (বাঙ্গালীর বল ২য় সংস্করণ ৭৪ পৃষ্ঠা)।

বীরজাতির বংশধর তুমি—রণক্ষেত্র তোমার ক্রীড়াক্ষেত্র—হিমালয় সেখানে উচ্চশিখরে কহে' "এ পথে তোমাকে আর অগ্রসর হইতে দিব না—সুশাণিত কুক্‌রি করে সেইপথে অগ্রগামী হওয়াই তোমার স্বধর্ম্ম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীজাতি জাগ্রত হইয়া উঠুক—এবং তাহারও সেইরূপ স্বধর্ম্মপালনের দিন ফিরিয়া আসুক।

ইতি—আশীর্ব্বাদক
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

অমর কুটীর, বারাকপুর।
২৮।১।৪০

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়--

চন্দন-নগর

৯ই মে ১৯৪০

প্রিয়বরেষু,—

১৩৩১ সালের পৌষমাসের ভারতবর্ষে প্রকাশিত আমার "চন্দন-নগরের বাঙ্গালী-সৈনিক" নামক প্রবন্ধটী বা তাহার অংশবিশেষ আপনার "সৈনিক বাঙালী" নামক পুস্তকে সংযোজিত করিবার জন্য আপনি যে আমার সম্মতি চাহিয়াছেন আমি আনন্দের সহিত এতদ্বারা আপনাকে সে সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনার প্রদত্ত আপনার "সৈনিক বাঙালী" পুস্তকখানি উপহার পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। বিগত মহাযুদ্ধে যে সকল বাঙ্গালী সৈনিকরূপে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয়, বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর্ ও ডবল্ কম্পানী গঠন হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত একটা আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস এমন সুন্দরভাবে বাঙ্গলাভাষায় লিখিত হইয়া কোন পুস্তক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। ইহার প্রকাশ যে বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা হৃদয়ের রক্তে জাতির কলঙ্ককালিমা বিধৌত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহারা নমস্য; তাঁহাদের কাছে জাতির ঋণ অপরিশোধনীয়। আপনি নিজে তাঁহাদের মধ্যে একজন, সুতরাং এ বিষয়ে লিখিবার আপনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আপনার এ গ্রন্থ আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশীয়দের প্রাণে প্রেরণা আনিয়া দিবে।

ইতি—শুভার্থী

শ্রীহরিহর শেঠ।

সূচনা

বাঙালীর সৈনিকদলে যোগ দিবার পূর্ব্বে কিছু ইতিহাস আছে। মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে শিখ, পাঞ্জাবী, গুর্খা, মারহাট্টা, পাঠান এবং রাজপুত প্রভৃতি সৈন্যেরা একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে সাম্রাজ্য রক্ষার কাজে সহজেই নিযুক্ত হ'তে পেরেছিল, কিন্তু বাঙালীর স্থান স্বভাবতই তাতে ছিল না। আধুনিক বাঙালী কোনদিন যুদ্ধ করেনি, তাদের মধ্যে শিক্ষিত সৈন্যও নেই কাজেই বাঙালী যুদ্ধে যাবে এ কল্পনা বাঙালীর মনেও আসেনি। কিন্তু সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে ভারতীয় সৈন্য যখন প্রয়োজন হ'ল যখন যুদ্ধক্ষেত্রে কাজের পরিমাণের কোন সীমা রইল না, তখন বাঙালী নেতারা আন্দোলন আরম্ভ করলেন যে বাঙালীর সেনাদলে যোগ দেওয়া উচিত, এবং গভর্ণমেণ্টেরও উচিত বাঙালীকে সৈনিকদলে নেওয়া। বাঙালী ডাক্তার, কেরানি, কুলি, খালাসি হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিল অনেক, কিন্তু সৈনিক হিসাবে তখনও কারো যাবার সুযোগ হয়নি। তাই প্রথম ঠিক হ'ল একটা সেবাদল বা অ্যাম্বুলেন্স কোর্ গঠন ক'রে তাই পাঠান হবে যুদ্ধক্ষেত্রে, যাতে ক'রে বাঙালী অন্ততঃ একটা দিকেও কিছু দুঃসাহসিক কাজ করবা'র সুযোগ পায়।

কলিকাতা টাউন হলে ১৯১৪ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে একটি সভা হয়। সভাপতি হন বর্দ্ধমানের মহারাজা। যুদ্ধে কি ভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি সেইটেই ছিল এ সভার আলোচ্য বিষয়। যথা-সময়ে সভার রিজলিউশন মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে সমর্থনের জন্য পাঠান হয়; তিনি তা পেয়ে ১৯১৪ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে লর্ড সিংহকে তারযোগে জানান যে একটি 'ষ্ট্রেচার বেয়ারার কোর' গঠনে

তাঁর সম্মতি আছে। এদের কাজ হবে আহত সৈনিকদের ষ্ট্রেচারে বহন করা এবং সেবা করা। দলে দলে বাঙালী এই 'কোরে' যোগ দিতে এল, কিন্তু পরে ঠিক হ'ল এরা ভারতবর্ষের সীমার বাইরে যাবে না, ভারতবর্ষের মধ্যেই কাজ করতে প্রস্তুত থাকবে। কাজেই এ ব্যবস্থা টিকল না, কেউই ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে থেকে কাজ করতে পচ্ছন্দ করলে না।

কাজেই ১৯১৪ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নূতন একটি স্কীম পাঠান হ'ল। প্রস্তাবিত দলের নাম হল 'ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্স কোর'। ১৫ই অক্টোবর তারিখে বড়লাট বাহাদুর জানালেন যে যদি এর খরচ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ বহন করে তা হ'লে এতে তাঁর সেনাবিভাগের কোন আপত্তি হবে না।

১৯১৫ সালের ৬ই মার্চ্চ তারিখে বড়লাট বাহাদুর তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতায় উল্লিখিত প্রস্তাবে সম্মতি ঘোষণা করলেন। বাংলাদেশের পক্ষে সে এক স্মরণীয় দিন। এত বড় সুযোগ যে বাঙালী লাভ করতে পারবে তা তার কল্পনারও অগোচর ছিল। তাই সেদিন তার যে রোমাঞ্চকর আনন্দ হ'য়েছিল তার তুলনা নেই।

যথাসময়ে 'অ্যাম্বুল্যান্স কোর' গঠিত হল এবং তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানর আয়োজন চলতে লাগল। ই-বি-আর থেকে একখানা ফ্ল্যাট কেনা হ'ল এবং সেই ফ্ল্যাট সাজিয়ে ভাসমান হাসপাতাল তৈরী হল। ১৯১৫ সালের ৮ই মে তারিখে এই হাসপাতাল ফ্লাটের নামকরণ উৎসব সম্পন্ন হল। এর নাম রাখা হ'ল "বেঙ্গলী"।

'বেঙ্গলী' ১০ই মে কলিকাতা ত্যাগ করে গেল। 'বেঙ্গলী'কে শিখ নামক জাহাজের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই "বেঙ্গলী"র অভিযান সফল হ'তে পারেনি। কারণ কলিকাতা ছাড়বার

লর্ড রোনাল্ড্‌সে

লর্ড সিংহ

লর্ড কারমাইকেল

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে যাঁহাদের আন্তরিক শুভ ইচ্ছায় ও উৎসাহে বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট গঠিত হয়েছিল।

কিছু দিনেব মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশকে স্তম্ভিত ক'বে খবব এল— 'বেঙ্গলী' মাদ্রাজেব নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ১৭ই মে তাবিখে রাত্রি ১১টাব সময ঝড়ে ডুবে গিয়েছে। টাকাব দিক দিযে ক্ষতিব পবিমাণ হ'ল প্রচুব, কিন্তু এতেও উৎসাহ দমল না, ববং বেড়েই গেল। কাবণ এব প্রায এক মাস পবে ১৯১৫ সালেব ২৮শে জুন তাবিখে নবগঠিত ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্স বি এন আব লাইনে বম্বে অভিমুখে বওনা হ'যে গেল "—সেখান থেকে মাদ্রাজ" নামক জাহাজে ২৮শে জুন তাবিখে বওনা হবে ব'লে।

'মাদ্রাজ' জাহাজ ছাড়ল ১লা জুলাই তাবিখে। সেই তাবিখে বাঙালী ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্স কোব উক্ত জাহাজে যুদ্ধক্ষেত্রে বওনা হ'যে গেল। তাঁদেব মধ্যে ছিলেন—

অফিসাব — ৫ জন
সাব্ অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জন — ৪ জন
হাবিলদাব — ৪ জন
নন-কমিশনড্ অফিসাব এবং প্রাইভেট — ৬৪ জন
অন্যান্য কাজেব জন্য সহকাবী — ৪০ জন

এই দল ১৯১৫ সালেব ১৫ই জুলাই তাবিখে আমাবা নামক স্থানে পৌঁছায। মেসোপোটেমিযাব টাইগ্রিস নদীব ধাবে বসবাব প্রায ১০০ মাইল উত্তবে আমারাব অবস্থান। এইখানকাব চাহালা খালেব উপব এক গোলাবাড়ীতে হ'ল তাঁদের আড্ডা। এ সমস্তই তখন ইংবেজেব দখলে। এইখানে অ্যাম্বুল্যান্স দল ১০০ জন আহত এবং পীড়িত সৈনিকেব সেবার ভাব প্রাপ্ত হলেন। এইভাবে আমাবায বেঙ্গল ষ্টেশনারি হস্পিট্যালেব প্রতিষ্ঠা হয।
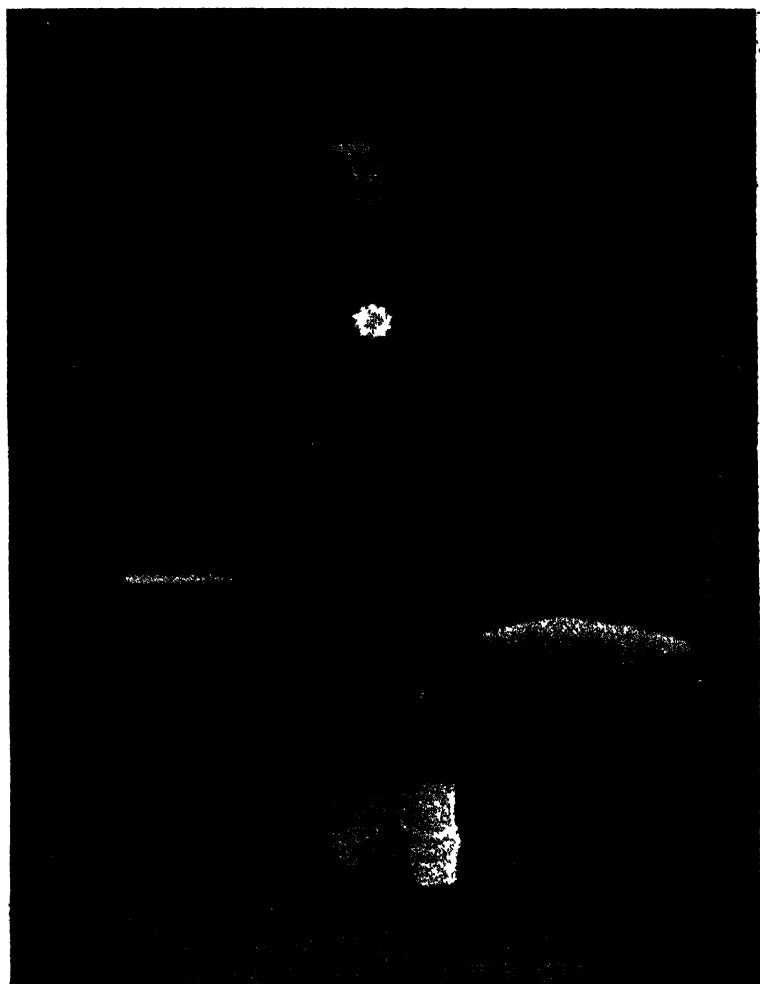
মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বৰ্দ্ধমান
জি. সি. আই. ই, কে. সি. এস্. আই, আই. ও এম্
প্রেসিডেণ্ট বেঙ্গল আম্বুল্যান্স কোর,
বেঙ্গলী ডবল কম্পানি কমিটি ও বেঙ্গলী রেজিমেঁণ্ট কমিটি ।

আই, ই, এফ, ডি-র ১৬নং ব্রিগেডের ২নং ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে হাবিলদার চম্পটির অধীনে ৩৬ জন লোক দিয়ে একটা ইউনিট বা দল গঠিত হয়। এই দল আমারা থেকে কুট অভিমুখে রওনা হ'য়ে যায়। কারণ এই সময় কুটও ইংরেজের হাতে আসে। বাগদাদের দক্ষিণে টেসিফন Ctesiphon নামক জায়গায় যখন তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে সেই সময় এঁরা এই যুদ্ধের মধ্যে গিয়ে পড়েন এবং সেখানকার আহত সৈনিকদের সেবাশুশ্রূষার ভার নেন, এবং যতদিন যুদ্ধ চলতে থাকে ততদিন এঁরা অক্লান্তভাবে আহত সৈনিকদের ফিল্ড হস্পিট্যালে স্থানান্তরিত ক'রে তাদের সেবাশুশ্রূষা এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে থাকেন। টেসিফন থেকে চলে আসবার সময় এঁরা যখন একটা নৌকায় আহতদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় এঁদের মধ্যেকার ছজন কর্ম্মী তুর্কীদের হাতে বন্দী হন। বাদ বাকি কর্ম্মী প্রধান সেনাবাহিনীর সঙ্গে কুটে ফিরে আসেন এবং কুটের অবরোধের সময় পর্য্যন্ত সেখানে থাকেন। কুটের যখন পতন হয় তখন হাবিলদার চম্পটি প্রভৃতি ১৮ জন কর্ম্মী তুর্কীদের হাতে বন্দী হয়ে তুরস্কে নীত হন।

ব্রিটিশ অফিসারগণ এবং স্বয়ং জেনারেল টাউনশেণ্ড এঁদের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। এঁরা বীরের মত যে সব কষ্ট অকাতরে সহ্য করেছেন তা সত্যই অতুলনীয়। "আর্মি ডেস্প্যাচে" এঁদের অনেকেরই নাম প্রশংসার সঙ্গে উল্লিখিত হ'য়েছে।

তুরস্ক থেকে এদের মুক্তি হয় যুদ্ধ বিরতির সময়—অর্থাৎ ১৯১৮ সালের ১১ই নবেম্বর তারিখে।

বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোর. গঠনে যে সকল নেতা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া গেল—

বর্দ্ধমানের মহারাজা।

লর্ড এস, পি, সিংহ।

কর্ণেল এস, পি, সর্ব্বাধিকারী।

ডাক্তার এস, কে, মল্লিক।

মিঃ বি, সি, চক্রবর্ত্তী।

অনারেবল ভূপেন্দ্রনাথ বসু। ইত্যাদি।

২নং ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে যুক্ত বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোরের একটি দল, কর্ণেল হেনেসির অধীন ১৬নং ব্রিগেডের সঙ্গে কুট থেকে আজিজি বা আজিজিয়া নামক স্থানে রওনা হন। এই অভিযানে তাঁরা যে অসীম ধৈর্য্য, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা অসাধারণ। কারন তাঁরা এই উপলক্ষে ৭৫ মাইল পথ কোথায়ও না থেমে সারা রাত কুট থেকে আজিজি পর্য্যন্ত মার্চ ক'রে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য ক্লান্তিবশতঃ বা অক্ষমতার অজুহাতে কেউই পিছিয়ে পড়েননি। জেনারেল টাউনশেণ্ড তাঁদের কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় পেয়ে বলেছিলেন, "মসীজীবী বাঙালী যে সৈনিকের কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত এ প্রমান তাঁরা দিয়েছেন।"

আজিজি অবস্থান কালে বাগদাদ অভিযানের পূর্ব্বে এঁরা দুটো খণ্ডযুদ্ধে প্রধান সেনাদলের সঙ্গে যোগদানের জন্যে দুবার মনোনীত হয়েছিলেন।

এই দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের পরিচয়—

১। হাবিলদার এ, সি,
চম্পটি … ইনি কুটে বন্দী হয়েছিলেন। এঁর নাম ডেস্প্যাচে উল্লেখিত হয়েছে।

কর্ণেল এস্ পি সর্ব্বাধিকারী

২।	ল্যান্স হাবিলদার পি, সি, সেন ...	কুটে বন্দী হয়েছিলেন।
৩।	নায়েক বি, কে, বসু ...	টেসিফনে যাবার পূর্ব্বেই অসুস্থ অবস্থায় ফিরে আসেন।
৪।	ল্যান্স নায়েক পি, কে, ঘোষ ...	কুটে বন্দী হয়েছিলেন।
৫।	" " এস, কে, রায় ...	" " "
৬।	প্রাইভেট এস, কে, মিত্র ...	টেসিফন যুদ্ধের পর ফিরে আসেন। ডেস্‌প্যাচে এঁর নাম উল্লেখিত হয়েছে।
৭।	প্রাইভেট আর, পি, সাহা ...	কুটে বন্দী হয়েছিলেন।
৮।	প্রাইভেট এ, সি, চক্রবর্ত্তী ...	" " "
৯।	প্রাইভেট বি, বি, চ্যাটার্জি ...	কুটে বন্দী হন, পরে বিপক্ষীয় বন্দীর বদলে ফিরে পাওয়া যায়।
১০।	প্রাইভেট এস, সি, লাহা ...	বার্জে বন্দী হন এবং বন্দী অবস্থায় মারা যান।
১১।	প্রাইভেট জে, সি, মিত্র ...	কুটে বন্দী হন।

১২।	প্রাইভেট এম, জেকব…	কুটে বন্দী হন।
১৩।	„ এ, এন, চ্যাটার্জি	টেসিফন যুদ্ধের পরে ফিরে আসেন।
১৪।	প্রাইভেট পি, বি, ঘোষ …	কুটে বন্দী হন।
১৫।	প্রাইভেট এস, কে, বসু …	টেসিফন যুদ্ধের পর পীড়িত হয়ে ফিরে আসেন।
১৬।	প্রাইভেট এম, এন, দে	বার্জে বন্দী হন।
১৭।	„ এস, এন, বসু	বার্জে বন্দী হন এবং বন্দী অবস্থায় মারা যান।
১৮।	„ এস, পি, সর্ব্বাধিকারী	কুটে বন্দী হন।
১৯।	প্রাইভেট জে, কে, মিত্র …	টেসিফন যুদ্ধের পর পীড়িত হয়ে ফিরে আসেন।
২০।	প্রাইভেট পি, এন, রায় …	কুটে বন্দী হন এবং বন্দী অবস্থায় মারা যান।
২১।	প্রাইভেট এন, পি, গাঙ্গুলি …	কুটে বন্দী হন।
২২।	প্রাইভেট এল, এম, চ্যাটার্জি (এ) ..	কুটে বন্দী হন। এঁর নাম ডেস্‌প্যাচে উল্লেখিত হয়েছে।
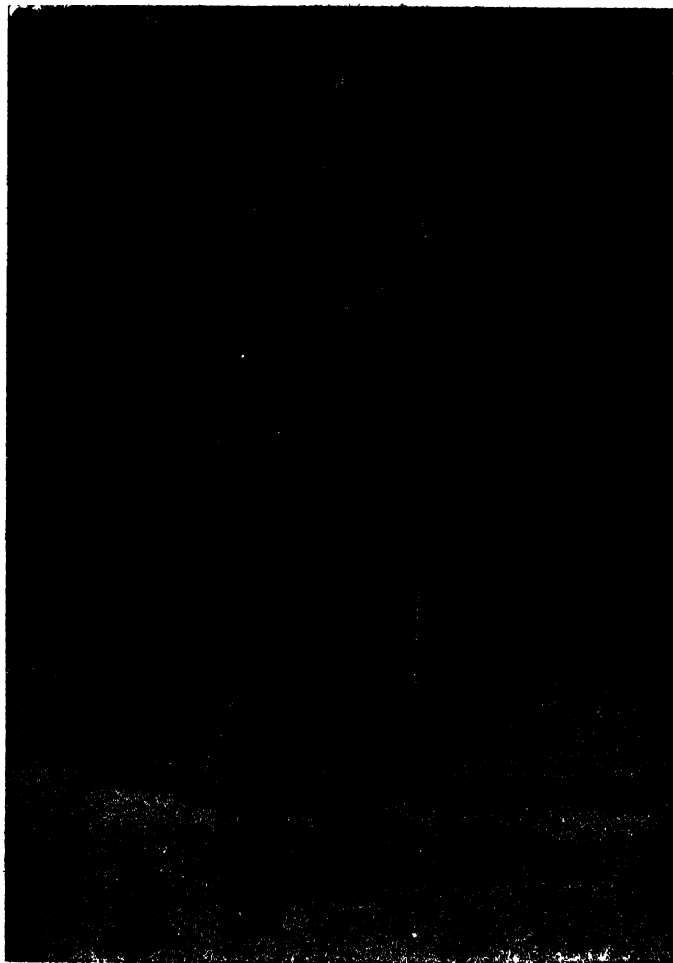
ওয়ার প্রিজনার

ভোলানাথ মুখার্জ্জি

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে ইনি জেনারেল টাউনসেণ্ডের সহিত ১৪৩ দিন কুট-এল-আমারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ ছিলেন ও পরে তুর্কির হস্তে বন্দী হন।

২৩।	প্রাইভেট পি, বি, দত্ত	...	কুটে বন্দী হন।
২৪।	„ বি, এন, চ্যাটার্জি	...	টেসিফন যুদ্ধের পর পীড়িত অবস্থায় ফিরে আসেন।
২৫।	প্রাইভেট শচীন্দ্রনাথ বসু	..	বার্জে বন্দী হন।
২৬।	প্রাইভেট বি, এন, মুখার্জি	...	কুটে বন্দী হন।
২৭।	প্রাইভেট জে, এন, মুখার্জি	...	বার্জে বন্দী হন, এবং বন্দী অবস্থায় মারা যান।
২৮।	প্রাইভেট এইচ, ডি, বসু	...	কুটে বন্দী হন।
২৯।	প্রাইভেট বি. সি, দত্ত	...	টেসিফন যুদ্ধের পর পীড়িত অবস্থায় ফিরে আসেন।
৩০।	প্রাইভেট এল, এম, ব্যানার্জি (বি)	...	„ „
৩১।	প্রাইভেট এ, কে, চ্যাটার্জি	...	বার্জে বন্দী হন, বন্দী অবস্থায় মারা যান।
৩২।	প্রাইভেট এফ, সি, চক্রবর্ত্তী	...	কুটে বন্দী হন।

৩৩।	প্রাইভেট এস, ব্যানার্জি ...	টেসিফন যুদ্ধের পর পীড়িত অবস্থায় ফিরে আসেন।
৩৪।	প্রাইভেট এন, এন, মুখার্জি (এ)	টেসিফন যুদ্ধে আহত হন এবং পীড়িত অবস্থায় ফিরে আসেন।
৩৫।	প্রাইভেট এন, সি, রায় চৌধুরী ...	টেসিফন যুদ্ধের পর পীড়িত অবস্থায় ফিরে আসেন।
৩৬।	প্রাইভেট আর, এন, মুখার্জি ..	" "
৩৭।	প্রাইভেট এস, কে, রায় ..	" " *

* শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ বোস, সুবেদার মেজর, বাহাদুর, আই, ডি, এস, এম, প্রণীত A Short Sketch of the Bengal Ambulance Corps and its Work in Mesopotamia নামক গ্রন্থ হইতে গৃহিত।

Nawab Habibullah.

জমাদার নবাব বাহাদুর ঢাকা

(বর্ত্তমানে The Hon'ble Lt. Nawab KHWAJA HABIBULLAH Bahadur of Dacca, Minister i/c Industries and Local Self-Government, Bengal)

AHSUN MUNZIL,
PALACE,
DACCA.

22. 3. 40

My dear Mon Bahadur

I am delighted to go through the pages of your Bainill Bangali which brings back some old memories of the glorious time we had in Mespot. I must congratulate you on your labours in bringing back to us the glorious past. I am sure the people of Bengal will read the book

and appreciate the time & labour you have given in bringing home to the people of Bengal and outside the services rendered by our youngmen during 1914-1918. I trust that Govt of India will after reading your book ~~den time~~ decide on having a ~~Batt~~ Battalion of Bengalees on a permanent basis

Yrs comrade in arms

M. Habibullah

(Nawab Bahadur of Dacca and Minister Government of Bengal. Formerly Officer, 49th Bengalee Regiment).

সৈনিক বাঙালী

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে ফ্রান্স, মেসোপোটেমিয়া ও কুর্দ্দিস্থানে বাঙালী পণ্টন

প্রথম পর্ব্ব

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমি অ্যাম্বুল্যান্স দলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বিবৃত করেছি। বাঙালীর এই আর্ত্তসেবকের দল আহত সৈনিক বহন করা এবং তাদের সেবাশুশ্রূষার কাজেই ব্যাপৃত রইল, বাঙালীরা সেনাদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পারলে না এই অবস্থাটা হ'ল নিতান্ত দুঃখের। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আর্ত্তসেবায় যারা কৃতিত্ব এবং যোগ্যতা প্রমাণ করেছে তারা যুদ্ধ কার্য্যেও কৃতিত্ব ও যোগ্যতা দেখাতে পারবে না কেন?

এ বিষয়ে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট প্রথম পথ দেখালেন। ফরাস-ডাঙ্গার বাঙালীদের নিয়ে একটি সৈন্যদল গঠিত হ'ল। বাঙালীর সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে যাবার প্রথম প্রেরণা আসে এই থেকেই। ১৩৩১ সালের পৌষমাসের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত ফরাসী চন্দননগরের প্রবীন জননায়ক পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের "চন্দন-নগরের বাঙ্গালী সৈনিক" নামক প্রবন্ধটী এইখানে উদ্ধৃত করছি।

চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈনিক

শ্রীহরিহর শেঠ

সুবর্ণপুরী ভারতে বৃটিশ অভ্যুদয়ের প্রথম সোপান এই চন্দননগর। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে অর্লেয়াঁ দুর্গের পাদমূলে এই ভূমিতেই ইংরাজের তথা বাঙ্গলার ভাগ্য নির্ণীত হইয়াছিল। আর কে জানে, ইংরাজি ১৯১৬ সালের ১৬ই এপ্রেলের চিরস্মরণীয় শুভ দিনে কুড়ি জন বাঙ্গলার স্বেচ্ছা-সৈনিক সন্তান মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া চন্দননগর হইতে ফ্রান্সে যাইয়া যে ব্রতের উদ্যাপন পূর্ব্বক ভার্দ্দুনের সমর-প্রাঙ্গণে বল পরীক্ষার পর জয়মাল্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহারা ভবিষ্য বাঙ্গালীর জন্য কোন্ সোণার পুরীর রুদ্ধ অর্গল খুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইয়োরোপের মহা-সাগর রূপ মহাসমরে জলবুদ্বুদ্‌সম এখানকার কয়জন বাঙ্গালী যুবকের যোগদানে ফরাসীদের কতটুকু বল বৃদ্ধি হইয়াছিল, জানি না। কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গলার ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে একটি মহিমময় পরিচ্ছেদের যোজনা করিয়া দিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরোপে সমরানল প্রজ্বলিত হইবার পর বৎসর ৩০শে ডিসেম্বর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সভাপতি প্রথম তাঁহাদের ফরাসী ভারতের অধিবাসীদের যুদ্ধাধিকার প্রদান করেন। তৎপরে ১৯১৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী ফরাসী-ভারতের তৎকালীন গভর্ণর মসিয়ে মার্তিনো (M. A. Martineau) দ্বারা উহা এখানে প্রচারিত ও বিধিবদ্ধ হয়; এবং ৭ই ফেব্রুয়ারি সহরের বহু স্থানে সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন

সৈনিক প্রথম দল   র পূর্ব্বে
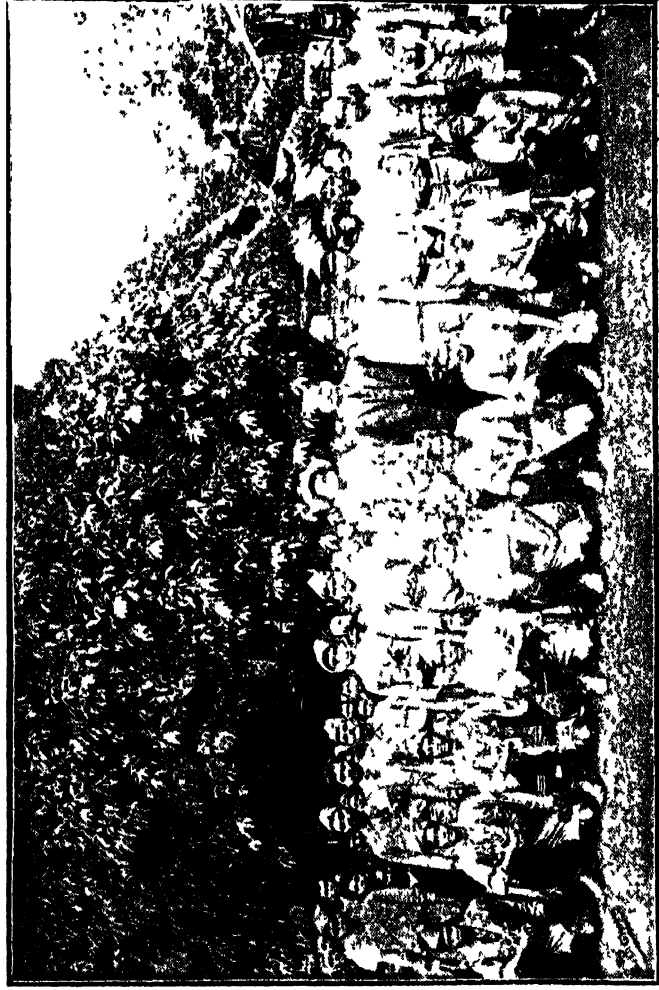
দ্বারা ফ্রান্সের সহায়তার জন্য যুদ্ধার্থী নাগরিকদিগকে আহ্বান করা হয়।

প্রথমে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫ জন যুবক স্বেচ্ছা-সৈনিক হইবার জন্য আবেদন করেন। তন্মধ্যে ১২ জন আবেদন প্রত্যাহার করেন। ৪৩ জন ডাক্তারি পরীক্ষায় অনুপস্থিত এবং অনুত্তীর্ণ হন। শেষে অবশিষ্ট কুড়ি জন প্রথম দলভুক্ত হইয়া পণ্ডিচারীতে প্রেরিত হন। সেদিন ইং ১৯১৬ সালের ১৬ই এপ্রেলের অপরাহ্ণ। সে একটি স্মরণীয় দিন, চন্দননগরের পক্ষে ত বটেই, সারা বাঙ্গলার পক্ষেও তাহা চিরস্মরণীয়। সেই মাল্য-চন্দন-বিভূষিত, জনসাধারণের উল্লাস ও পুরমহিলাগণের শঙ্খধ্বনি-মুখরিত, বিপুল জনসংঘের পুরোভাগে বিংশতি সংখ্যক বাঙ্গালী যুবকের ফরাসী ত্রিবর্ণ পতাকা হস্তে ফ্রান্সের উদ্দেশে রেল ষ্টেশনে যাত্রা যিনি দেখিয়াছেন তিনি কখন ভুলিতে পারিবেন না। সে দিন সহরের চাঞ্চল্য ও উল্লাস এবং সহস্র সহস্র নরনারীদের দ্বারা সৈন্যগণের সংবর্দ্ধনা, এবং সহরের ও দূরাগত সম্ভ্রান্ত জনগণের বিপুল সমাবেশ বর্ণনার অতীত। এই দলে ছিলেন ফণীন্দ্রনাথ বসু, তারাপদ গুপ্ত, রমাপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সরকার, বিপিনবিহারী ঘোষ, হারাধন বক্সী, সিদ্ধেশ্বর মল্লিক (ঘোষাল) করুণাময় মুখার্জ্জি, জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ, অমিতাভ ঘোষ, বলাইচন্দ্র নাথ, মনোরঞ্জন দাস, রাধাকিশোর সিংহ, সন্তোষচন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ রায়, অনিলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, আশুতোষ ঘোষ, পাঁচকড়ি দাস, ব্রহ্মমোহন দত্ত ও হাবুলচন্দ্র দাস।

প্রথম দল চলিয়া যাইবার দুই মাস পরে যতীন্দ্রনাথ দে, সতীশচন্দ্র শেঠ, অজয়প্রসাদ বসু, কানাইলাল ভট্টাচার্য্য, অনিলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি, ললিতমোহন দে, পরেশনাথ চ্যাটার্জ্জি ও গোবর্দ্ধনচন্দ্র দাস নামক আর আটজন যুবক যাত্রা করেন। এই উভয় দল পণ্ডিচারী পৌঁছিবার

স্বেচ্ছা-সৈনিক প্রথম দল পণ্ডিচারীতে

পর তথায় সকলের পুনরায় ডাক্তারি পরীক্ষা হয়। ইহাতে অনুত্তীর্ণ হওয়ায় আশুতোষ ঘোষ ও পাঁচকড়ি দত্ত বর্জ্জিত হন। বাকি ২৬ জন ঐ মাসের শেষেই ফ্রান্সে যাত্রা করেন। এই সকল যুবকই ভদ্রবংশীয়। তাঁহাদের বয়স ১৬ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে। ইহাদের মধ্যে বলাইচন্দ্র নাথ ও গোবর্দ্ধন দাস অন্য সকলের অপেক্ষা ছোট। বলাইয়ের বয়স তখন ১৬ বৎসর মাত্র। নরেন্দ্রনাথ সরকারের বয়স সকলের অপেক্ষা অধিক ছিল।

পণ্ডিচারীতে যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিবার পর তাঁহারা ফ্রান্সে প্রেরিত হন। তথায় কিছু দিবস ফরাসী সামরিক বিদ্যালয়ে সমর কৌশল শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারা একেবারে রণক্ষেত্রে প্রেরিত হন। এই সময় তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়, এবং তুর্ল, বিজান্ত, ট্রিপলিটন্, আরগন্, এলসেস্ ভার্দ্দুণ, সেণ্ট্ মিহিয়েল্ প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হন। ইঁহাদের মধ্যে অনেককে গোলন্দাজের কার্য্যেও নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া সামরিক কর্তৃপক্ষ ফরাসীদের বিখ্যাত ৭৫ মিলিমিটার কামান পরিচালনা করিয়া জার্ম্মাণ ব্যূহভেদ কার্য্যের দায়িত্বভার পর্য্যন্ত ইঁহাদের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পণ্ডীচারী হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সকল স্থানে সর্ব্ব ক্ষেত্রেই সাহসিকতা, উদ্যম ও ত্যাগশীলতা দেখাইয়া বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। পণ্ডিচারীতে শিক্ষাকালে লেফ্টেনাণ্ট জিলে মহোদয় ইঁহাদিগকে সকল সেনাদলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাদল বলিয়াছিলেন। ফ্রান্সে ইঁহাদের যে সুখ্যাতিলাভ হইয়াছিল, তাহা তৎকালীন সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন।

এই বাঙ্গালী বীরগণের যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিতা ও নির্ভীকতার

সৈনিক বাঙালী

শ্রীযুক্ত অমিতাভ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ

কথা ভাবিলে বাঙ্গালী হৃদয়ে যে আত্মপ্রসাদ জন্মে, তাহা কেবল অনুভব-যোগ্য—তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তাঁহারা চন্দননগরের তথা সমগ্র বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। যাহারা আপন হৃদয়ের রক্তে জাতির কলঙ্ক-কালিমা বিধৌত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছে বাঙ্গালী জাতির ঋণ শোধ হইবার নহে। বাঙ্গালী তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বীর যুবকদিগের কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ সকলকেই 'Victory', 'Interallie' ও 'Volunteer' নামক তিনটি করিয়া পদক দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র নাথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্রশ দে গ্যার (Croix de Geurre) নামক বিশেষ পদক দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযুক্ত হারাধন বক্সী উভয়ে যথাক্রমে সমর বিদ্যালয়ের উচ্চ ও নিম্ন গ্রেডের পরীক্ষায় এবং অফিসারস্ প্লাটুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই প্রথম শ্রেণীর গোলন্দাজ ছিলেন এবং অস্থায়ী ব্রিগেডিয়ারের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে এই পদে পাকা করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কেবল স্থান ও রেজিমেণ্ট বদল হওয়ার জন্য তাহা হয় নাই। তাঁহারা যে সকল সৈন্য দলভুক্ত হইয়া কাজ করিয়াছিলেন তাহার নাম,—

11 em Regiment d' Infenterie colonial 25 em Compain

7 em Groupe d' artillerie a Bizerte 8 em.

10 em Regiment d' artillerie Toulon

6 em Regiment d' artillerie 6 em. Batterie

9 em. Regiment d' Infenterie colonial Dap-Co. Hue' (Annam) Indo-chine.

4 em Infenterie colonial.

154 em artillerie a' pied.

6 em artillerie d' Afrique.

6 em artillerie a' pied.

তাঁহারা মোট প্রায় তিন বৎসর ফ্রান্সে ছিলেন। মাঝে একবার মাত্র দেশে আসিবার অনুমতি পাইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। শেষে আরমিষ্টিসের পর একেবারে ফিরিয়া আইসেন। দ্বিতীয়বার কয়েকজনকে এখান হইতে ইণ্ডোচীনে পাঠান হইয়াছিল। সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, করুণাময় মুখার্জ্জি এবং হাবুলচন্দ্র সরকার যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত বরাবরই ফ্রান্সে ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, যুবকগণ ফিরিয়া আসিলে, যখন তাঁহাদের দেশবাসী তাঁহাদিগকে অতি আদরে, অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া আসিলেন, তখন দলের মধ্যে যুবক মনোরঞ্জনকে তাঁহারা আর ফিরিয়া পাইলেন না। মনোরঞ্জন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া বিজারে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই স্থানেই তাঁহার দেহাবশেষ ফরাসী সৈনিকদের পার্শ্বে গোর দেওয়া হয়।

ভলেন্টিয়ারদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সহায়তার জন্য এডমিনিষ্ট্রেটরের সভাপতিত্বে যে ভলেন্টিয়ার কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তাহার তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে মনোরঞ্জনের নামে ডুপ্লে কলেজে, যেখানে মনোরঞ্জন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইখানে একটি দেওয়ালে একখানি প্রস্তর-ফলক রাখা হইয়াছে। এবং প্রতি বৎসর উক্ত বিদ্যালয়ের দুইটি যোগ্য ছাত্রকে একটা মাসিক বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কার্য্যের ব্যবস্থা ও ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার জন্য স্থানীয় নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরের ট্রাষ্টীদিগের হস্তে টাকা দিয়া তাঁহাদের উপর ভারার্পিত হইয়াছে। উল্লিখিত কমিটীর ভাণ্ডারে চন্দননগর

ভিন্ন বাহিরের কতিপয় ভদ্রলোকও সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের উদ্যোগ ও প্রাথমিক চেষ্টায় এই কমিটী গঠিত হয়। স্বর্গীয় তিনকড়িনাথ বসু মহাশয়ও ইহার পুষ্টি সাধনে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এই স্বেচ্ছা সৈনিক সংগ্রহ, দল গঠন ও প্রেরণ এবং বিদায় অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা ব্যাপারে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের চেষ্টা সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, হারাধন বক্সী ও নরেন্দ্রনাথ সরকারের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি এ কার্য্যে অগ্রসর হন। প্রথম ও শেষোক্ত যুবকই স্বেচ্ছাসৈনিক হইবার জন্য প্রথম আবেদন করিয়াছিলেন। উক্ত ব্যাপারে স্বর্গীয় তিনকড়িনাথ বসু, মণীন্দ্রনাথ নায়েক, রূপলাল নন্দী, হরিহর শেঠ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

প্রথম ভলন্টিয়ারবৃন্দের বিদায় উপলক্ষে মাননীয় এডমিনিষ্ট্রেটর মসিয়ে ভ্যাঁসা ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় যে উদ্দীপনাপূর্ণ সময়োপযোগী সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের এখনও মনে আছে। সৈনিকদিগের বিদায় ও সম্বর্দ্ধনা ব্যাপারে বাহিরের যে সকল বিখ্যাতনামা নেতা ও সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্যার (এক্ষণে লর্ড) শ্রীযুক্ত এস্, পি, সিংহ, শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত এস্, কে, মল্লিক, স্বর্গীয় পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত জে, চৌধুরী, রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত বি, কে, লাহিড়ী প্রভৃতিও ছিলেন। প্রথম দল ছুটীতে আসিলে, দ্বিতীয়বার তাঁহাদের বিদায় দিবার কালে, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক বিদায়-সম্বর্দ্ধনা সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন দেশে এমন সংবাদপত্র কমই ছিল বা ছিল না, যাহাতে এই

সকল পথ-প্রদর্শক বীর যুবকদের সাহস ও বীরত্বের কাহিনী না ঘোষিত হইয়াছিল। *

বিশেষ সংক্ষেপেই এখানকার প্রথম পথ-প্রদশক বাঙ্গালী স্বেচ্ছা-সৈনিকদিগের কথা বলা হইল। কিন্তু আর একটি বাঙ্গালী বীরের কথা না বলিলে এ গৌরব-কথা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। ইঁহার বিষয় শেষে ব্যক্ত হইলেও সাহসিকতা, শৌর্য্য, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতিতে ইনি কোন অংশে কম নহেন, বরং অধিক বলিতে পারা যায়। কারণ, যখন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পক্ষ হইতে যুদ্ধে যাইবার জন্য কোন ডাক আইসে নাই, যখন বাঙ্গালীর ছেলে যুদ্ধে যাইতে পারে, এ কথা কাহারও কল্পনাযও আইসে নাই, ইনি তখন একাকী স্বেচ্ছায় নীরবে সৈন্যদলে যোগদান করেন। এই বীর যুবকের নাম যোগীন্দ্রনাথ সেন। ইনি শিবপুর কলেজে পড়িতে পড়িতে, উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিলাত যান। তথায় লিড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর শিক্ষার পর বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এঞ্জিনিয়ার হন। তৎপরে তথায় পূর্ত্ত বিভাগে সহকারী এঞ্জিনীয়ারের পদে একটি কার্য্য গ্রহণ করেন।

এই কাজ করিতে করিতে যখন মহাসমর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন যোগীন্দ্রনাথ সমর-বিভাগে অফিসারের কার্য্যের জন্য আবেদন করেন। ভারতবাসী বলিয়া প্রথম সে আবেদন অগ্রাহ্য হয। তৎপরে তিনি যখন বুঝিলেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হওয়া সহজ নয়, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া সামান্য সৈনিকের পদপ্রার্থী হইয়া পুনরায়

---

* এই স্বেচ্ছা-সৈনিকদিগের কথা লিখিতে ভলেণ্টিয়ার শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের নিকট হইতে অনেক সহায়তা পাইয়াছি। সেজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি—লেখক।

সৈনিক অবস্থায় স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সেন

(ইনিই প্রথম বাঙালী, যিনি গত মহাযুদ্ধে হত হন)

আবেদন কবেন। এই আবেদন মঞ্জুব হইল, তিনি পলস্ ব্যাটেলিযন্ (Pals battalion) নামক সৈন্যদলে স্থান পাইলেন। এই ব্যাটেলিযন্ পবে ওযেষ্ট ইযর্কশাযাব বেজিমেণ্টেব (West Yorkshire Regiment) অঙ্গীভূত হইযা যায। এই স্থানে নয মাস কাল শিক্ষাব পব কিছু দিনেব জন্য তিনি মিশবে প্রেবিত হন, এবং তৎপবে তথা হইতে তাঁহাকে ফ্রান্সেব বণক্ষেত্রে লইযা যাওযা হয। এইস্থানে তাঁহাকে প্রকৃত যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয। যোগীন্দ্রনাথ সৈনিকেব যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাব নাম প্রাইভেট্। তাঁহাব কার্য্যদক্ষতা এবং ন্যায-পবাযণতাব জন্য, তথাকাব কর্তৃপক্ষেব নিকট তিনি বিশেষ প্রশংসা লাভ কবিযাছিলেন, এবং তাঁহাবা সন্তুষ্ট হইযা তাহাকে তিনটি পদক পুবস্কাব দিযাছিলেন। তাঁহাব গৌববে দেশবাসীব গৌবব বাড়িযাছে, কিন্তু সে গৌবব বুকে ধবিযা তিনি আব স্বদেশে ফিবিতে পাবিলেন না। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেব ২২শে মে বাত্রে, জীবনেব শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য পালন কবিতে কবিতে বীব যোগীন্দ্রনাথ ফ্রান্সেব সমবক্ষেত্রে জার্ম্মাণীব অস্ত্রে প্রাণ বলি দিলেন। মৃত্যুব পব তথায ইনি সামবিক সম্মান পাইযাছিলেন। ফ্ল্যাণ্ডাবসেব এলবার্ট নগবে এই বাঙ্গালী যুবকেব নাম ও বেজিমেণ্টেব নাম লিখিত ক্রুশ্ চিহ্নিত একটি সামান্য কববে এই বাঙালী সুবকেব দেহাবশেষ প্রোথিত আছে।

যোগীন্দ্রনাথেব যুদ্ধে যাইবাব জন্য নাম লিখানব সংবাদ পাইযা যখন তাঁহার বৃদ্ধ পিতাব পক্ষ হইতে তাঁহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে নিবৃত্ত হইবাব জন্য পত্র লেখেন, তখন তিনি অগ্রজকে লিখিযাছিলেন,—"আমি ফিবিযা গিযা বাঙ্গালীব মুখে চুণ কালি দিতে পাবিব না।" এই যুবকেব মৃত্যুতে সম্রাটেব সহানুভূতি প্রকাশেব কথা, লর্ড কিচনাব তদীয অগ্রজ ডাক্তাব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশযকে জানাইযাছেন। তাঁহাব ব্যবহৃত ঘড়ি

চশমা প্রভৃতি দ্রব্যাদি যত্ন সহকারে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যোগীন্দ্রনাথের বহু গুণকীর্ত্তনসহ তাঁহার রেজিমেণ্টের অফিসার ও তাঁহার অধ্যাপকগণের কতিপয় পত্রও যতীন বাবু পাইয়াছিলেন।

যতদূর জানা গিয়াছে, ইনিই বিগত মহাযুদ্ধে হত বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম। এত বড় যুদ্ধে প্রথম বাঙ্গালী সন্তান যিনি বুকের রক্তে ইয়োরোপের রণাঙ্গন রঞ্জিত করিয়াছেন, তিনি চন্দননগরের অধিবাসী। চন্দননগরের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমরা এখনও তাহার স্মৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টিত হই নাই। তাহার একখানি সামান্যভাবের প্রতিকৃতি মাত্র স্থানীয় নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। আর সেই গৌরবের আধার বীর যুবকের প্রাণহীন নশ্বর দেহাবশেষ আত্মীয়-বন্ধুহীন দেশের জনশূন্য প্রান্তরের মৃত্তিকাতলে পড়িয়া কালের প্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। একজন সাধারণ সৈনিকের প্রাপ্য যাহা কিছু সম্মান তাহা দিতে ইংরাজরাজ একটুও কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। আর তাঁহার দেশবাসী আমরা এই নয় বৎসরের মধ্যে তাহার যোগ্য স্মৃতিরক্ষাকল্পে, তাঁহার মৃৎসমাধি পাকা করিবার জন্য বা সহরের কোন প্রকাশ্য স্থানে তাহার একটি প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপন, অথবা একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য কিছুই করিলাম না। কোন মহাপুরুষের স্মৃতির পূজা করিলে তৃপ্তি আমাদের, মুখোজ্জ্বলও আমাদেরই। নচেৎ মহাপুরুষদের কি আসিয়া যায়। চন্দননগরের স্বেচ্ছাসৈনিকগণের উক্ত স্মৃতিমন্দিরে একখানি প্রতিকৃতি রক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। যে যুবকদের কার্য্যে বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত হইয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল হইয়াছে বলিয়া তৎকালে বহু সংবাদপত্র ও নেতৃবর্গ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যদি তাঁহাদের যোগ্য সম্মান

প্রদর্শন বা স্মৃতি রক্ষায় আমরা পরাঙ্মুখ হই, তবে আমাদের গর্ব্ব বৃথা, আমরা মনুষ্যত্ববর্জ্জিত।"

বাংলাদেশের নেতারাও ১৯১৬ সালে আন্দোলন আরম্ভ করেন এই বলে যে বাঙালীদের সৈনিক হিসাবে নিতে হবে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার এস, কে, মল্লিক, বর্দ্ধমানের মহারাজা, ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি উৎসাহী নেতা। এই আন্দোলনের ফলে তাঁদের মনোবাঞ্ছা কিছু পরিমাণে পূর্ণ হ'ল। অর্থাৎ ১৯১৬ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে ঢাকাতে বাংলার গভর্ণর প্রস্তাবিত বাঙালী পল্টনের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিলেন :—

Proposed Bengali Regiment

"One thing more I want to tell you. The Viceroy has been considering the position with the Commander-in-Chief and with the other Members of his Government. They have determined to try as an experimental measure to raise a double company of infantry composed of Bengali on precisely the same terms as are offered to the Indian Army generally.

Enlistment will be for the period of the war with option to the Soldiers of remaining in the service if they choose after its conclusion. The Double Company, when formed, will be located on the frontier for training and when properly trained may be sent on field service. That the Government of India should be willing to consider this now, while war is going on, while their anxieties are great, while their thoughts must be more

than fully occupied, shows that they have not neglected the feelings of Bengal. That they should be willing to make the experiment is proof that they do sympathise with us, that they do believe that Bengalis are loyal and are devoted. Surely it is the duty now of every one who loves Bengal to see that the experiment shall succeed to show that emotional and impetious as the Bengalis undoubtedly are they are generous enough to exercise self-control, that they are ready to submit to discipline and will do their part when asked, just as well as other people do their part without demanding any exceptional or better terms".

The announcement made at the Bengal Legislative Council Meeting at Dacca by His Excellency Lord Carmichael, The Governor of Bengal. August, 7, 1916.

"*The Bengalee*"

Tuesday, August, 8, 1916.

১৯১৬ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখের "বেঙ্গলী" সংবাদপত্র নিম্নলিখিত সংবাদ দিলেন :—

Bengali Regiment

A double company of Bengalees has been sanctioned by Government. Recruits for enlistment must be Bengalees between 16 to 30 years of age, chest 32 inches, height 5 ft. 4 inches. Services till the end of the war and optional afterwards.

Destination—Wherever required. At present to be sent to the Indian Frontier for training.

Dr. S. K. MULLICK
46, Beadon Street.

১৯১৬ সালের ২২শে আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ঘরে কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের দ্বারা এক সভা আহূত হয়।

Meeting at B. I. Association

The Hon'ble Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan presided over an important meeting to consider the steps to be taken regarding the organisation of the "Bengalee Double Company" held in the British Indian Association Rooms on Tuesday at 4-45 p.m.

Among those present were the following :—The Hon. Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan, The Hon. Sir S. P. Sinha, Babu Motilal Ghosh, The Hon. Babu Bhupendra Nath Basu, Mr. J. N. Banerjee, Babu Satish Ch. Palchaudhuri, Babu Kumar Kristo Mitter, Col. Tanner, Captain Tate Dr. M. N. Mitter, Mr. A. N. Chaudhuri, Mr. S. C. Mitter, Mr. N. Ghatak, The Hon. Babu Surendra Nath Roy, Mr. B. K. Lahiri, Mr. B. Chakrabarty, Raja Jyot Kumar Mukerjee, Kumar Manindra Chandra Sinha, Mr. J. Chaudhuri, Rai Jadunath Majumdar Bahadur, Babu Piyush Kanti Ghose, Mr. H. M. Bose and Dr. S. K. Mullick. Dr. Mullick proposed that the Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan to take the chair. Dr. Mullick said that the inception of the scheme was mainly due to the efforts of the Maharajadhiraj, who in his speech at the association in a former occasion strongly pleaded for the enlistment of Bengalees in the Army. Sir S. P. Sinha seconded the motion.

The Maharajadhiraj said that the enthusiasm of the Bhadralog class for enlistment as Regulars must be welcome. The selection should however rest in the hands of the Military authorities and whoever come forward with any number of men should be referred to the Military authorities. Recruiting should not be confined entirely to the Bhadralog class. But efforts should be made to have at least one Company recruited from other classes who formerly used to from the fighting materials of Bengal, such as the Gowalas, Aguries etc.

The tension was that on the Indian Army Regulation pay for the Bhadralog could not be permanently expected to continue in the Indian Army. For this purposes and for the permanency of the scheme, a regular recruiting propaganda should be started throughout Bengal for all classes.

There was an idea of amalgamating the Bengal Ambulance Corps Committee with the "Bengalee Double Company" Committee about to be formed. The speaker as President of the Bengal Ambulance Corps could not say anything in that direction without consulting that Committee, for the Bengal Ambulance Corps Committee still existed. Sir S. P. Sinha said that before Dr. Mullick read out his notes he would like to say that this was a great opportunity for the Bengalees to carry arms and that they should avail themselves of it; for as His Majesty's subjects they should do their part to establish their claims to bear arms. At the same time in such a matter there should be no spirit of bargaining for it should be with them a matter of volunteering.

Once bargaining prevailed, the whole thing would collapse. What however, he would suggest was that the proposed committee should give consideration to the sacrifice to be made by the men offering their services (while others remained in comfortable circumstances) and try and make some extra payments for the aid of their families etc. but on no account should this extra payment be a matter of agreement, but purely and simply a voluntary undertaking.

Mr. A. N. Chaudhuri endorsed every syllable uttered by Sir S. P. Sinha.

The business before the meeting was, he said, that an offer has been made which was to be accepted or declined on own terms. Of course it must be accepted. Dr. Mullick then said before the meeting a progressive statement and pointed out that while the Military authorities required 228 men for the Double Company he had already over 300 applications from the Bhadralog class, and more applications were coming in and entertained since many might be pronounced unfit by the Military authorities and a certain portion might not present themselves at the right moment.

The manner in which the young men were coming up clearly showed that there would be no want of men.

They had this large number of applications though not a meeting had been held or a circular issued.

Ultimately the number would be multipled several times over if the scheme were made widely known throughout the province. Col. Tanner was asked several

questions regarding the recruiting, supplementing the allowances of the Bengali Soldiers etc.

Regarding the former question he laid a paper on the table and in answer to the latter he said that the Government would have no objection to the soldiers' pay being supplemented by subscription or otherwise. He stated that this Double Company would be attached to the 55th Kohat Rifles, Gurkhas, Punjabees etc.

Regarding the procedure of recruiting, he said, any committee or individual could bring in any recruits for examination by the Military authorities.

The following resolutions were carried unanimously that the thanks of the meeting be conveyed to the Government of India and the Government of Bengal for the sanction of the formation of the Double Company of Bengalees. Resolved that an Executive Committee of twelve persons consisting of the following members be formed to invite recruits and take all necessary steps for the organisation of the Double Company in consultation with the Military authorities, that of this Committee of twelve, there should be a President, a Secretary, two Treasurers and eight members, that this Committee be authorised to fill in any vacancies that might occur in it and also if necessary to co-opt members at any particular meeting, and that three should form a quorum.

President—The Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan.

Members—The Hon. Sir S. P. Sinha, Sir R. N. Mookerjee, The Hon. Babu Bhupendra Nath Basu, Babu

Motilal Ghose, Babu Surendra Nath Banerjee, Mr. C. R. Das, Dr. S. P. Sarbadhikary, Mr. Satish Chandra Mitter.

Treasurers—Mr. B. Chakrabarty, Mr. A. N. Chaudhuri.

Secretary— Dr. S. K. Mullick.

Resolved that a General Committee consisting of the following gentlemen be formed with power to add to their number and that Executive Committee should not enter into any financial arrangements without the consent of the General Committee.

The General Committee contained one hundred and forty-six names including Zemindars, wealthy merchants and professional men

Resolved that a Working Committee be formed consisting of the following members :—

Dr. S. P. Sarbadhikary.

Mr. A. N. Chaudhuri

Mr. Satish Chandra Mitter.

Dr. S. K. Mullick.

The meeting dispersed at about 6-30 p.m.

"The Bengalee"
Thursday, August 24, 1916.

১৯১৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেমস্‌ফোর্ড সিমলা থেকে ঘোষণা করলেন ঃ—

Recruiting has been opened to several classes to whom Military Service was previously closed.

Considerable public interest has been aroused by the sanction given for the formation of a Bengali Double

Company which will be trained on the Frontier and sent on active service. The Bengali Stationary Hospital recently broken up, rendered admirable service in Mesopotamia and its record there was one of which the promoters of the scheme may well be proud of.

"The Statesman"
Wednesday, September 6, 1916.

গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষামূলক ভাবে ২২৮ জনকে নিয়ে একটি মাত্র বাঙালী ডাবল্ কম্পানি গঠন করতে অনুমতি দিলেন। বাংলার চিররুদ্ধ সৈনিক জীবনের দ্বার এতদিনে উন্মুক্ত হ'ল।

বাঙালী যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনাপূর্ণ ভাবের বন্যা বয়ে যেতে লাগল। স্কুল, কলেজ, চাকরি এবং ব্যবসা ছেড়ে সকল শ্রেণীর বাঙালী যুবক ট্রেনে ষ্টীমারে বা পায়ে হেঁটে বাংলার বিভিন্ন সহর ও সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম, সেণ্ট জর্জ্জ গেট রিক্রুটিং অফিসে এসে জড়ো হ'তে লাগল। কেল্লার গেটগুলি সে সময়ে সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল।

"এসেছে সে এক দিন
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন!"

যে ১০ জন বাঙালী যুবক সর্ব্বপ্রথম বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়েছিল, তাদের জন্য ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ৬টার সময়

কলিকাতার টাউন হলে বৰ্দ্ধমান মহারাজাধিরাজের সভাপতিত্বে একটি বিদায় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়েছিলেন :—

I only want to say a few words to congratulate you, and to wish you every good fortune. You have come forward willing to serve your King-Emperor and your country in a cause which you believe is a good one, and I must sincerely wish you every good fortune, as I would wish it to many young men in all parts of the British Empire who are doing the same. I congratulate you as I would congratulate many young men in all parts of the Empire, because you have come forward and in doing so have shown that you recognise that you owe a duty not to our King-Emperor only, but to our fellow subjects and that you are willing to discharge that duty. We all owe that duty. I hope we all recognise that we owe it, but it is not possible for us all to show, as you have done, that we owe it. You are fortunate in being able to show it; I feel sure you think that, and if you do I feel sure you won't want to have much said about it, at any rate in your presence.

But there is a special reason for congratulating you. You are the first body of Bengalees to whom the privilege has been given of going to serve as soldiers. Hitherto, it has not been known that the

people of Bengal were suited to be soldiers. There is nothing to be ashamed of in that. There are many people who for one reason or other are not suited to be soldiers—I am one myself and I expect there are others on this platform who would say the same thing of themselves. The army must, to a great extent, be run on business lines. It has to be paid for out of public money, out of taxes, and it is the duty of those who spend the taxes to see that they get for the public good value for their money.

It is, therefore, not a thing to be wondered at, still less a thing to be grumbled at, if those who are responsible for sending soldiers for the army have not tried to recruit in places where it has been the general opinion that it is not very easy to find soldiers.

None of us can deny that among Bengalees themselves the general opinion hitherto been that Bengal is such a place. I know that there have been some, at any rate, ever since I have known Bengal, who have fretted at that view; and I have all along sympathised with them. They were glad, and I was glad, when it was announced that the Government of India have sanctioned the formation of a Double Company in Bengal.

It may not seem a great concession to make, and in peace time it would seem a very small one; but this is war time, and we must remember that to many people it seems very unusual, and perhaps

even an unjustifiable thing that the Government should be willing to make what we must all admire is an experiment, and take and train some men as soldiers on the distinct promise that when they are trained they will be sent on active service, even though they belong to a race who have not up to the present been looked on, or who have not for the most part themselves claimed to be, particularly suited for fighting. It is an experiment—admittedly an experiment—and there is only one thing which can justify it; that is if those who go make the experiment a success.

The Great Responsibility

As the Viceroy said yesterday, considerable public interest has been aroused by the sanction for the formation of the Double Company. That is why I especially congratulate you. You will not have an easy time, probably to many of you it may seem a very hard time, especially at the beginning during the period of your training, but all the same I congratulate you, for you are knowingly incurring a great responsibility. What you do, or do not do, will bring credit or the reverse, not on yourselves only, but on the whole of your fellow country-men. You, I fancy, believe, if any one believes—and many believe it, that Bengalees ought to do well in warfare, as they can do well in peace. It lies with you to secure them that chance.

I believe you will rise to your opportunity, that you will show that, not only can your people be brave, as many people know they can be, but that they can also—and this is of much more importance and is not so often believed—submit to discipline. Again to quote His Excellency the Viceroy "the Bengalee Stationary Hospital recently in Mesopotamia and its record there was one of which the promoters of the scheme may well be proud of."

It is for you to do equally well. You are being given a chance, a chance which many envy but which I hope none grudge you.

Hundreds of young men have been, and are being, trained as you are going to be trained; but have no certainty—many of them have very little hope of seeing active service, they must be kept probably for long, if not for the whole of their services on some of those thankless, unexciting but often unpleasant jobs which many soldiers know only too well.

You have been promised that when you are trained you will be given what all soldiers long to be given—a chance of going on active service. I am glad you have been promised this, and I feel sure you will show yourselves worthy of it.

That is why I especially congratulate you. Once more, in a word, I wish you well.

"*The Statesman*"
Thursday, September, 7, 1916.

১৯১৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের সকাল বেলা এক যুবক আর কয়েকজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে উদ্বেলিত এবং উন্মাদনাপূর্ণ অন্তরে সেণ্ট জর্জ্জ গেট দিয়ে ফোর্টের ভিতর গিয়েছিল। সে ঠিক সেনাদলে ভর্ত্তি হ'বে বলেই যায়নি। সে সেখানে গিয়েছিল তার কোনো পরিচিত বন্ধু ভর্ত্তি হয়েছে কিনা তাই দেখতে। পূর্ব্বেই ব'লেছি সে এক ভাবের উন্মাদনা এসেছিল বাংলাদেশের বুকে। সেই ভাব সবারই অন্তর স্পর্শ করেছিল। তাইত, যে যুদ্ধে যাবে বলে কল্পনা করেনি সেও সেনাদলে যারা যোগ দিচ্ছে তাদের দেখে হর্ষ অনুভব করেছিল। যারা যুদ্ধে যাবার গৌরব লাভ করলে, তাদের গৌরবের অংশ নেওয়াও যে ছিল তখন সৌভাগ্যের বিষয়।

সেই যুবক লেখক স্বয়ং। আমি সেদিনকার সেই আনন্দ এবং উত্তেজনা আজ ঠিকমত বর্ণনা করতে পারব না। সেদিন বিস্মিত মনে শুধু তাকিয়ে ছিলাম তাদের দিকে যারা ঘরের মায়া অনায়াসে কাটাল, যারা ভেসে চল্‌ল অজানার উদ্দেশ্যে। আমরা নদীর স্রোত দেখলে মুগ্ধ হই—জীবন্ত প্রাণবন্ত সচলতা দেখলে মুগ্ধ হই—সেদিন দূরগামী বাঙালী যুবকদের জীবনে দেখেছিলাম সেই স্রোত। যেন প্রখর বেগে দুই তীরে কল-হাস্য ছড়িয়ে সেই স্রোত প্রবাহিত হয়ে চল্‌ছে—আর আমি দূর থেকে বিস্মিত নয়নে তাই দেখছি।

রিক্রুটিং অফিসের সামনে বহু বাঙালী যুবক দাঁড়িয়ে হল্লা করছে, তখনও বেলা দশটা বাজেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই

দু'তিনজন ইউরোপীয়ান, কয়েকজন কেরানি এবং চার পাঁচজন পাঞ্জাবী সেপাই অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর এলেন একজন সাহেবী বেশধারী বাঙালী ভদ্রলোক। তিনি দুএকজন যুবকের সঙ্গে আলাপ ক'রে অফিসের ভিতরে গেলেন। পরে শুনলাম ইনিই হচ্ছেন ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক—যিনি বাঙালীর যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পথ সুগম ক'রে দিয়েছিলেন। ইউরোপীয়ানদের মধ্যে ছিলেন একজন মেডিক্যাল অফিসার আর দুজন রিক্রুটিং অফিসার।

যারা পূর্ব্বে নাম লিখিয়ে গিয়েছিল তাদের সাত আট জনকে এক একটি ব্যাচ্ বা দলে বিভক্ত করে ডাক্তারি পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। ডাক্তারি পরীক্ষার পর যুবকদের মধ্যে কেউ বা হাস্‌তে হাস্‌তে কেউ বা বিষণ্ণ মুখে ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রায় সাড়ে বারোটার সময় ডাক্তার মল্লিক ও তিনজন অফিসার বাইরে বেরিয়ে এলেন। যারা ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছিল তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ডাক্তার মল্লিক করমর্দ্দন করলেন। আর যারা উত্তীর্ণ হ'তে পারেনি তাদের যে কি দুঃখই হ'য়েছিল! তারা ডাক্তার মল্লিককে অনুনয় বিনয় করতে লাগল ভর্ত্তি হবার জন্যে। তিনি বল্‌লেন, এখন ত আর উপায় নেই!—তা শুনে তারা হতাশভাবে ফিরে গেল। তাদের বিষণ্ণ মুখচ্ছবি এখনও আমার মনে যেন ভেসে উঠ্‌ছে।

আমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে এই সব দেখ্‌ছিলাম। হয়ত আমারও মন সেই মুহূর্ত্তে এই সব গৃহছাড়া সুদূরের যাত্রীদের সঙ্গে

একাত্মতা অনুভব কর্‌ছিল। আমি যেন দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম। আমি সেনাদলে ভর্ত্তি হব এমন কল্পনা আমার ছিল না তা পূর্ব্বেই ব'লেছি। কিন্তু তবু যে আমি প্রায় দু'ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সে কিসের আকর্ষণে? কিসের আশায়? আশা বা আকর্ষণ কিছুই ছিলনা। আমি সেই মুহূর্ত্তে নিজেকে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম যেন আমিও এদের সঙ্গে যুদ্ধে যাচ্ছি। অকারণে তাদের আনন্দে সেদিন আমারও আনন্দ হ'য়ে উঠেছিল।

ডাক্তার মল্লিক আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমাকে দেখে প্রশ্ন করলেন "তুমি ভর্ত্তি হ'বে না?" প্রশ্নে চমকিত হ'য়ে উঠ্‌লাম। আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। বল্‌লাম, আমাকে কি ভর্ত্তি কর্‌বেন?" ডাক্তার মল্লিক আমার কাঁধে হাত দিয়ে বল্‌লেন, কেন নয়? নিশ্চয় তোমাকে ভর্ত্তি কর্‌বে—তুমি আজই বিকেল ৪টার সময় এখানে আস্‌বে।" এই ব'লে তিনি চলে গেলেন। সেই মুহূর্ত্তে আমার মনে যে কি আনন্দ হ'য়েছিল তা ভাষায় ব্যক্ত কর্‌তে পারব না। যা ছিল আমার স্বপ্ন, সেদিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত রূপে তা আমার কাছে অকস্মাৎ সত্য হ'য়ে উঠ্‌ল! এক মুহূর্ত্তে আমি এক নতুন মানুষ হ'য়ে উঠলাম। পৃথিবীর রং সহসা আমার চোখে বদলে গেল—পায়ের নীচের পৃথিবী যেন অস্থির হ'য়ে উঠল, যেন সেই মুহূর্ত্তে আমার যাত্রা হ'ল সুরু। কোথাও কোন বাধা নেই, বাঁধন নেই— ইউরোপের মহাযুদ্ধে আমি যোগদান কর্‌ব এ কল্পনা, এ আনন্দ

আমার পক্ষে অসহনীয় হ'য়ে উঠল। ছোট আমি হঠাৎ অত্যন্ত বড় হ'য়ে উঠলাম, আমার মধ্যে যে শক্তি ছিল ঘুমিয়ে, তা হঠাৎ জেগে উঠল, আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম পথে।

সেণ্ট জর্জ্জ গেট পার হ'য়ে যখন রেডরোডে প'ড়েছি তখন দেখি ঘোড়ার গাড়ী থেকে এক মহিলা আমাকে ডাক্‌ছেন। আমি কাছে যেতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "ভাই, তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ ?" উত্তরে আমি ব'ল্‌লাম, "রিক্রুটিং অফিস থেকে আস্‌ছি।" তিনি উদ্বিগ্নভাবে বল্‌লেন, "আমার স্বামী আজ সকালে কাউকে না ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, এখনও তাঁর কোন খোঁজ পাইনি। তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে জান্‌লাম, তিনি এদিকে এসেছেন যুদ্ধে নাম লেখাবার জন্যে। তাঁরই খোঁজে আমি এসেছি—বাড়িতে ছেলে মেয়েরা কান্নাকাটি ক'র্‌ছে—ভাই তুমি যদি কেল্লাতে গিয়ে একবার দেখে এস তা হ'লে বড় উপকার হয়।" ভদ্রলোকের বয়স, চেহারার বর্ণনা ও নাম জেনে আবার কেল্লার মধ্যে ফিরে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি অফিসের সামনে দু'একজন ছাড়া আর সবাই চলে গে'ছে। ফিরে এসে ভদ্রমহিলাটিকে তা ব'ল্‌লাম। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন।

বিকেলে গেলাম ফোর্টে। তখন ডাক্তারি পরীক্ষা আরম্ভ হ'য়ে গেছে। ডাক্তার মল্লিক অফিসের ভিতরে ছিলেন। একটি স্লিপে আমার নাম লিখে ভিতরে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি বাইরে এসে আমাকে সঙ্গে করে আবার ভিতরে গেলেন। সেখানে আমার হাতে একটি ফর্‌ম দিয়ে নাম ধাম ইত্যাদি পূরণ করতে ব'ল্‌লেন।

তারপর একটি ব্যাচের সঙ্গে ডাক্তারের ঘরে ঢুক্‌লাম। ডাক্তারি পরীক্ষা খুব কড়াকড়ি ভাবে হচ্ছিল। উপস্থিত আটজনের মধ্যে তিনজন সেই ভাগ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল। তার মধ্যে আমি একজন। আমার সাফল্যে ডাক্তার মল্লিক খুব খুশী হলেন।

ব্যারাকের অন্যান্য যুবকদের সঙ্গে মিশে পড়লাম। আমাদের প্রত্যেকের জন্যে দৈনিক ছয় আনা দেওয়া হ'ত খোরাকি বাবদ। ১৯১৬ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে কেল্লা থেকে প্রথম ব্যাচ্ ১০ জন * রংরুট বা রিক্রুট রাত্রে নৌসেরা রওনা হ'য়ে গেল। আমরাও সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা কর্‌তে লাগলাম। অস্থায়ী কেল্লাবাস মোটেই ভাল লাগছিল না। তা ছাড়া অনেকেরই ভয় ছিল পাছে দেরী হলে বাড়ির লোকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন কেউ এলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যেত। সে সময় কে যে কোথায় লুকিয়ে পড়্‌বে তা নিয়ে হৈ হৈ পড়ে যেত। স্থানে অস্থানে সব লুকিয়ে থাকত। তারপর দর্শনপ্রার্থী আত্মীয়ের ফিরে যাওয়ার পর সবাই নিশ্চিন্ত হ'ত। যদি কেউ কারো কথা

---

* কেল্লা হ'তে যে দশজন রিক্রুট প্রথম ব্যাচে নৌসেরা রওনা হ'ল তাদের নাম—

১। জগদীশ বৰ্দ্ধন
২। পুলিন মণ্ডল
৩। যতীন বিশ্বাস
৪। ফণী লাহিড়ী
৫। রমাপতি ভট্টাচার্য্য
৬। চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
৭। জিতেন পাণ্ডে
৮। প্রবোধ চক্রবর্ত্তী
৯। সুধীর সেন
১০। শচীন রায়

জিজ্ঞাসা করত, যুবকেরা ব'লত, জানি না।—পাছে সঙ্গীকে ভাঙিয়ে নিয়ে যায় সবারই এই ভয় ছিল।

যুদ্ধে যাবার জন্যে মনের মধ্যে যে উৎসাহ এবং উন্মাদনা এসেছিল তাতে ঘরে ফিরে যাবার কল্পনা কারও মনে আসে নি। তাই কেউ ফিরিয়ে নিতে আস্ছে শুন্‌লেই মন খারাপ হ'য়ে যেত। মনের এই অবস্থায় পিতামাতার চোখের জল, পত্নীর সকাতর দৃষ্টি, সন্তানদের ক্রন্দন-ধ্বনি—বাঙালী যুবকদের কিছুমাত্র টলাতে পারেনি।

আমরা সেদিন সত্যই মনেপ্রাণে বিশ্বাস ক'রেছিলাম—

"ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কাল বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।"

২০শে সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে খবর পেলাম আমাদের দ্বিতীয় ব্যাচের পুলিসের ভেরিফিকেশন এসে গেছে (রিক্রুটিং অফিসে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর প্রত্যেক যুবকের সম্বন্ধে স্থানীয় পুলিসের রিপোর্ট দরকার হ'ত) এবং সেই রাত্রেই আমাদের রওনা হ'তে হবে। আমাদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সময় যেন আর কাটে না, কখন সন্ধ্যা হবে, কখন আমরা স্নেহময়ী মাতৃভূমির সকল মায়া কাটিয়ে তাঁরই মুখ উজ্জ্বল করতে রওনা হয়ে যাব। আত্মত্যাগের দ্বারা, সাহসের

দ্বারা, বীর্য্যের দ্বারা দেশের সম্মান বাড়ানোর আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনকে অধিকার করেছিল। এক একটি মিনিট এক একটি ঘণ্টার সমান মনে হচ্ছিল।

প্রায় ৫টার সময় ফোর্ট থেকে হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হলাম। সেখানে দেখি জনসমুদ্র! হর্ষে আনন্দে গর্ব্বে মন অভিভূত হ'য়ে পড়ল। সেদিন যা দেখেছি, সেদিন জীবনে যে সম্পদ লাভ করেছি, তা কখনও ভুলব না। আমাদের কামরার সামনে দুধারে দুটো সিঁদুর মাখানো মাটির কলসী ও ছোট ছোট দুটো কলাগাছ দিয়ে মঙ্গলঘট বসানো হয়েছে। লেডিজ্ কমিটি প্রত্যেককে এক-একটি ক'রে ব্যাগ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে সাবান, মাথার তেল, আয়না, চিরুণী, তোয়ালে, চিঠির কাগজ, খাম, পেন্সিল ইত্যাদি ছিল। মাতৃহৃদয়ের স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ সেই দানই সেদিন ছিল আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়। মন সেদিন আমাদের কানায় কানায় পূর্ণ। কথা বলবার শক্তি ছিল না, নীরব বিস্ময়ে, বিপুল পুলকে, অসীম কৃতজ্ঞতায় সেদিন হৃদয় আলোড়িত হ'য়ে উঠেছিল। হয়ত চোখে দু-এক ফোঁটা জলও দেখা দিয়েছিল।

উপস্থিত বন্ধুদের সঙ্গে প্রণাম, নমস্কার, আলিঙ্গন প্রভৃতির ধূম পড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ছিল একজন পাঞ্জাবী হাবিলদার ও দুজন নায়েক—বেচারীরা একদিকে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে এই সব দেখছিল, হয়ত তাদেরও বঞ্চিত হৃদয় সেদিন এসব দেখে বিচলিত না হ'য়ে পারে নি।

গার্ডের বাঁশী বাজল। গাড়িতে উঠ্‌ছি এমন সময় একটি বাঙালী মেয়ে মধুর কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"ভিক্টোরিয়া ক্রস্ আনা চাই কিন্তু।" 'ভিক্টোরিয়া ক্রস্!' সৈনিক জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান—প্রত্যেক সৈনিকের স্বপ্ন। তাই আনব আমরা? আনব কি না জানি না, তবু বাঙালী কন্যা আমাদের জন্যে সেদিন উচ্চতম আশাই করেছিলেন। অজানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে এই আশা যে মনের মধ্যে কতখানি শক্তি সঞ্চার করে তা বর্ণনা করি এমন ক্ষমতা আমার নেই।

সারাদিন হৈ চৈ ক'রে আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, সুতরাং গাড়ীতে অনেকটা আরাম বোধ হচ্ছিল। নিজেদের জিনিসপত্র বিছানা ইত্যাদি ঠিক ক'রে কেউ চিৎ হ'য়ে কেউ বা ব'সে, কেউ বা জানালার বাইরে তাকিয়ে আছি। ট্রেন ছুটে চলেছে।

যে ষ্টেশনেই গাড়ি থামছে সেইখানেই বহু লোক আমাদের বিদায় দিতে আসছে। এই ভাবে লুপলাইন ধ'রে দিনের পর দিন রাতের পর রাত চ'লে আমরা এলাম আম্বালা ষ্টেশনে। সেখান থেকে গাড়ি বদল ক'রে এলাম লাহোর। এইখানে পূজনীয়া সরলা দেবী চৌধুরাণী ও পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাদের বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করলেন। এই উপলক্ষে তাঁরা বহু উপভোগ্য আয়োজন করেছিলেন। লাহোর ছেড়ে এলাম আমরা রাওয়ালপিণ্ডিতে—আমাদের গাড়ি তার পর পেশোয়ারের ডাকগাড়ির সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়া হ'ল।

পাহাড়ের উপর দিয়ে, টানেলের ভিতর দিয়ে গাড়ি চল্‌ল ছুটে। সেই রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে দেখলাম আমাদেরই নূতন পথের রূপ। সেই বন্ধুর পথে, সেই অজানা কঠিন পথে চলেছি এগিয়ে। এ পথ কোথায় নিয়ে আমাদের উত্তীর্ণ করবে? এ পথ কি জীবনের না মৃত্যুর? এ প্রশ্ন মনে জেগেছিল—মনে মনেই তার উত্তরও পেয়েছি। জীবনের হোক মৃত্যুর হোক—আমরা কঠিন বন্ধন এবং জড়তা থেকে মুক্তি লাভ করে যে পথকে আশ্রয় করেছি—সে হয়ত জীবনের পরিপূর্ণতার মধ্যেই আমাদের উত্তীর্ণ করবে। আমরা মৃত্যুকে জয় করে অমর হ'ব।

Bengal Bids Adieu

To

Her Soldier Sons

Second Batch Starts

Wednesday, September, 20, 1916.

At 5 p. m. recruits in charge of a Havildar and two Naiks of the 46th Punjabees, the regiment to which they were to be attached, marched to the station accompained by Dr. S. K. Mullick, Dr. S. P. Sarbadhikary, Mr. N. N. Ghatak and Mr. S. C. Mitter who marched all the way with them.

They reached Howrah station where the assembled crowd with a wild ovation greeted them. They were received by the Members of the Committee and

distinguished ladies and gentlemen, among whom were :—

Mrs. P. K. Roy, Mrs. S. K. Mullick, Little Romola, Mrs. Mrigendra Lall Mitter, Mrs. N. N. Ghatak, Mrs. S. C. Mitter, Miss Mitter and other members of the Ladies Committee.

Dr. S. K. Mullick, Dr. S. P. Sarbadhikary, Hon. Mr. S. N. Roy, Hon. Provas Chandra Mitter, Mr. Jogendra Nath Bose, Mr. N. N. Ghatak, Mr. S. N. Haldar, Mr. D. N. Basu, Mr. J. R. Banerjee, Mr. Ajoy Dutt, Mr. Bejoy Chandra Singh of the "Hindoo Patriot", Mr. S. C. Mitter and others. Captain Tate and Lt. Brown came to the station on behalf of the Military Authorities.

Names of Recruits

1 Sureswar Mukherjee.
2 Amal Chandra Ganguly.
3 Upendra Nath Mullick.
4 Sachit Kumar Sircar.
5 Kumar Adhikram Majumder M. A. B. L. Vakil
6 Bejoy Ratna Bhattacherjee.
7 Sudhansu Ranjan Ghosh.
8 Naba Kumar Mohanta.
9 Nagendra Nath Ghatak.
10 Satyendra Nath Kundu.
11 Tarak Nath Banerjee.
12 Rajendra Lal Mukerjee.
13 Haridas Sen.

14 Surendra Nath Somaddar.
15 Monbahadur Singh.
16 Nripendra Narayan Roy Choudhury
17 Rammay Bhattacherjee.
18 Gopi Kumar Roy Choudhuri.
19 Sarat Kumar Mitra.
20 Khagendra Nath Bose.
21 Santosh Kumar Dey.
22 Atal Behari Mukerjee.
23 Khestra Nath Majumdar.
24 Jagadish Chandra Mukerjee.
25 Sailendra Nath Ghose.
26 Dulal Chandra Haldar.
27 Nagendra Chandra sen.
28 Ramkanai Mujumdar
29 Durgapada Banerjee.

Nic-named "John" by the Fort people.

30 Satish Kumar Kar.
31 Radha Charan Bhar.
32 Susil Kumar Bose.

"The Bengalee"
Thursday, September 21, 1916.

দ্বিতীয় পর্ব্ব

নৌসেরা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পেশোয়ারের ২৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত একটী শহর এবং সেনানিবাস। আমাদের ছাউনির উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা দিয়ে পাহাড়ী কাবুল নদী এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে। নদীর অপর পারে দূরে পাহাড়গুলি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ পাহাড়ের গায়ে অর্দ্ধস্বাধীন পার্ব্বত্য পাঠানের বাস। আফ্রিদি নামক আর এক দুর্দ্ধষ জাতি ওখানে বাস করে। এরা এক এক জন নেতার অধীনে চলাফেরা করে এবং মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। আর সুযোগ পেলেই লুঠতরাজ ক'রে বন্দুক বা খাদ্যসামগ্রী আত্মসাৎ করে।

আমাদের ছাউনিতে সারি সারি দুদিকে লম্বা বারান্দাওয়ালা ১৬টী ব্যারাক। এই ব্যারাকগুলোর নাম 'চিত্রল লাইন'। ষ্টেশন থেকে মার্চ ক'রে যখন চিত্রল লাইনে এসে পড়লাম, তখন আমাদের আগে যে সব রংরুট এসেছিল তারা হৈ হৈ

এইখানে ব্রিটিশ সেনা বিভাগের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ব্রিটিশ সেনা-বিভাগের সম্পূর্ণ পরিচয় এ নয়, তা ছাড়া গত মহাযুদ্ধের পর থেকে এর অনেক পরিবর্ত্তনও হয়েছে। সেই সময়ে যে রকম ছিল তার মোটামুটি পরিচয় দিয়েই আমার বক্তব্য শেষ ক'রব।

ব্রিটিশবাহিনী প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

ক'রে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমেই লেডিজ কমিটির দেওয়া থ'লেগুলি হস্তগত করলে। তারা আমাদের আগে এসেছে কাজেই তারা আমাদের চেয়ে সীনিয়ার, সুতরাং তাদের দাবী বেশী! এ দাবী অবশ্য বন্ধুত্বের এবং ভালবাসাব। তাই তারা যখন আমাদের সম্পত্তিগুলো ডাকাতি ক'রে কেড়ে নিলে তখন তাদের উপব আমরা লেশমাত্র বিবক্ত হইনি, বরঞ্চ তাতে আমরা আনন্দিতই হয়েছি।

আমাদের পৌঁছবার পর থেকেই তারা আমাদের সাহায্যে লেগে গেল। শুনলাম ৪৬নং পাঞ্জাবী রেজিমেণ্টের সঙ্গে শিক্ষালাভের জন্যে আমাদের যুক্ত ক'বে দেওয়া হয়েছে। যা হোক, চা এবং হালুয়াই সে সময়ের মত হ'ল আমাদের প্রধান

(১) বিমান শক্তি (Aerial Force)
(২) নৌশক্তি (The Navy)
(৩) স্থল সৈন্য (The Army)

স্থল সৈন্যের আবার কয়েকটা বিভাগ—

(১) পদাতিক (The Infantry)
(২) গোলন্দাজ (The Artillery)
(৩) অশ্বারোহী (The Cavalry)

এ ভিন্ন পদাতিক সৈন্য—ক্ষিপ্রতা, দৈহিক উচ্চতা এবং লক্ষ্যভেদের দক্ষতা অনুসারে লাইট ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি, হেভি ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি ও রাইফল্‌ রেজিমেণ্ট নামে অভিহিত হয়। কিন্তু সকলেরই শিক্ষাপদ্ধতি বা কুচ্‌কাওয়াজ প্রায় একই প্রকার।

আকর্ষণ—যুদ্ধশিক্ষা যার সঙ্গে ইচ্ছা হোক আপত্তি নেই। জল-যোগ শেস ক'রে শোবার ব্যবস্থাটা দেখা গেল। প্রত্যেকের জন্য একটি ক'রে খাটিয়া। রান্নাঘর ব্যারাকের কাছেই। পাতকুয়ো প্রায় দু তিনশ গজ দূরে। শৌচাগার আরও দূরে। রাত্রে মাংস রুটি ও দই যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন ক'রে খাটিয়ায় চিৎপটাং হয়ে পড়া গেল। তখন ওখানে ভীষণ শীত। শীত-নিবারক কম্বল ইত্যাদির ব্যবস্থা ভালই ছিল। খুব হল্লা করছিলাম। কিন্তু যখন লাস্ট পোস্টের বিউগল্ বেজে উঠল তখন সবাই নীরবে নিদ্রাদেবীর উদ্দেশ্যে সাধনা আরম্ভ করলাম। মন ছিল অতিরিক্ত চঞ্চল, সুতরাং ঘুমোতে অনেক রাত হয়ে গেল।

তারপর সকাল! কিন্তু জলের ব্যবস্থা দূরে থাকাতে এবং স্বাস্থ্যনীতি পালনের কড়া ব্যবস্থা থাকাতে আমাদের মধ্যে যে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সে সবের বিস্তারিত বর্ণনা

এরপর ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদলের বিভিন্ন পদ বা র‍্যাঙ্কএর পরিচয় দিচ্ছি।

রিক্রুট বা রংরুট

সিপয় বা সেপাহী

ল্যান্স নায়েক নায়েক হাবিলদার	এঁদের নন্-কমিশন্ড অফিসার বা সংক্ষেপে এন্-সি-ও বলা হয়।
হাবিলদার মেজর কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার	এঁদের ওয়র‍্যাণ্টেড অফিসার বলা হয়।

রুচিবিগর্হিত হবার আশঙ্কায় এই দৃশ্যের সূচনাতেই এর উপর যবনিকা টেনে দিলাম।

যথাসময়ে ব্যারাকে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে কিছু প্রাতরাশ উদরস্থ ক'রে জমাদার পাঞ্জাব সিংএর নিকট হাজির হলাম। জমাদার সাহেব সৈন্যদের ছোটখাটো নিয়ম পালন সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিলেন, তারপর গেলাম কোয়ার্টার মাস্টার অফিসে। সেখানে আমরা প্রত্যেকে পেলাম এক এক জোড়া বুট. উলের মোজা, পট্টি, এক একটা গলা আঁটা খাকি কোট বা উর্দ্দি, বেল্ট, সতরঞ্চি, গরম মোটা গেঞ্জি ও শার্ট। পাগড়িও দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা আপত্তি করলাম পাগড়ি পরতে। এই সব নিয়ে ব্যারাকে ফিরে এলাম। বুটজোড়া কি ভয়ানক ভারি! ওজন বোধ করি সের তিনেকের কম হবে না। অনেকদিন গুদামে পড়ে থাকাতে তার সারা গায়ে সাদা একটা স্তর জমে গেছে,

---

ভারতীয় কমিশনড্ র‍্যাঙ্ক

জমাদার সুবেদার সুবেদার মেজর	এঁদের সনদ বড়লাট বাহাদুর দিয়ে থাকেন, সেইজন্যে এঁদের বলা হয় ভাইস্রয়েজ কমিশন।

ব্রিটিশ র‍্যাঙ্ক

রিক্রুট	কর্পোর‍্যাল
প্রাইভেট	সার্জ্জেণ্ট
ল্যান্স কর্পোর‍্যাল	সার্জ্জেণ্ট মেজর

কিন্তু তখন কি আর ঘরের পালিশ করা অ্যালবার্ট শ্লিপারের কথা ভাববার সময় ছিল? ঐ দুটো আস্ত জানোয়ার-বিশেষ দুখানা বুটই তখন আমাদের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধির পক্ষে ছিল অপরিহার্য্য। পদসুখ থেকে পদগৌরব বেশি মূল্যবান।

আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রংরুটরা আমাদের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ সুতরাং সিনীয়ার মনে ভেবে আমাদের উপর একটু আধটু হুকুম চালাতে আরম্ভ করলে। একজন আমাকে হুকুম করলে এক মশক জল কুয়ো থেকে তুলে দিতে। সুবোধ বালকের মত

ব্রিটিশ কমিশনড্ অফিসার

সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট লেফ্‌টেন্যাণ্ট ক্যাপ্টেন্ মেজব লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল কর্ণেল ব্রিগেডিযাব জেনাবেল মেজব জেনাবেল লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনাবেল জেনারেল ফিল্ড মার্শাল	এঁদেব সনদ দিযে থাকেন ভাবত সম্রাট, সেই জন্যে এঁদেব বলা হয কিংস্ কমিশ

এ ছাড়া সাধারণত একটি ব্যাটালিয়ন ও কোযার্টার জমাদাব, কোযার্টার মাষ্টার হাবিলদার এবং ব্রিটিশ ও ভারতীয অ্যাডজুট্যাণ্ট প্রভৃতি থাকে।

হুকুম পালন করতে গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি জল অনেক নীচুতে। বহু কষ্টে বালতিতে ক'রে জল তুলে মশক ভর্ত্তি করলাম এবং জলভর্ত্তি মশক পিঠে নিয়ে ঠিক ভিস্তিওয়ালার মত রান্নাঘরে এনে পৌঁছে দিলাম। এই আমার সামরিক জীবনের প্রথম 'ডিউটি' বা কাজ!

তারপর আমরা সকলে দল বেঁধে কাবুল নদীতে গেলাম স্নান করতে। সেই ঠাণ্ডাজলে স্নান ক'রে যেন আমাদের পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপ ধুয়ে গেল—যেন আমরা স্নানান্তে নবধর্ম্মে দীক্ষিত হতে চলেছি। সমাজ সংসার সমস্ত যেন আমাদের মন থেকে দূর হ'য়ে গেছে। আমাদের মিলিটারি আইন ছাড়া

যে দেশে বা প্রদেশে যুদ্ধ বাধে, ফিল্ড মার্শাল সেই দেশে বা প্রদেশে 'কোর কম্যাণ্ডার' রূপে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধের ফলাফল সমস্তই এঁদের কৌশল ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে।

সংক্ষেপে একটি ব্যাটালিয়নে থাকে :—

ব্রিটিশ অফিসার	১৩ জন
ভারতীয় "	২০ "
হাবিলদার মেজর	৫ "
কোয়াটার মাষ্টার হাবিলদার	১ "
হাবিলদার	৬০ "
নায়েক	৪২ "
ল্যান্স নায়েক	৪০-৬০ "
সিপাহী	৮৯৬ "

আর কোথাও কোন বন্ধন নেই। কাজেই যার যা খুশী করছি, প্রাণখুলে চেঁচাচ্ছি, গান করছি, এক এক প্লেটে দুতিনজন ক'রে খেতে বসেছি, হল্লা করছি, আর-একজনের প্লেট থেকে কেড়ে খাচ্ছি, কাউকে খাইয়ে দিচ্ছি—আমরা সবাইমিলে যেন একটা নতুন সমাজ সেখানে গড়ে তুলেছি। আমাদের অতীতকে আমরা ছেড়ে এসেছি, ভবিষ্যতও আমাদের অনিশ্চিত, কাজেই বর্ত্তমানকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে তার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত সমস্ত মনেপ্রাণে উপভোগ করছি। একটি মুহূর্ত্ত বৃথা নষ্ট হ'লে আর ত তা ফিরে পাব না! জীবন যে অনিত্য সে কথা ত বাল্যকাল হ'তেই জানি, কিন্তু সে দিন সামরিক জীবনে, জীবনের অনিত্যতা যে রকম স্পষ্ট ক'রে অনুভব ক'রেছি, এমন আর কোনদিন করিনি। আরও অনুভব করেছি মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই, ধর্ম্মে ধর্ম্মে

এ ছাড়া ধোপা, নাপিত, মেথর, মুচি, ছুতার, দরজি, ভিস্তি, পাচক, সহিস, খানসামা, বাবুর্চি, বাসন মাজবার লোক, সাব্ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, ও হাঁসপাতাল আবদালি প্রভৃতি একটি ব্যাটালিয়নে সংযুক্ত থাকে।

আমাদের ব্যাটালিয়ন নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত ছিল—

১৪ জন সিপাহীতে একটি সেক্‌শন।

৪টি সেক্‌শনে (৫৬) একটি প্লাটুন।

৪টি প্ল্যাটুনে (১২৪) একটি কম্পানি।

৪টি কম্পানিতে (৮৯৬) একটি ব্যাটালিয়ন।

কোন ভেদ নেই, আমরা সবাই মিলে এক—সবার ধর্ম্ম এক—সবার জাতি এক। আমাদের সেনাবাস যেন আমাদের ডাক দিয়ে বলছিল—

"এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খৃষ্টান,
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার"—

পূর্ব্বেই বলেছি বাঙালী রংরুটদের শিক্ষাব ব্যবস্থা হয়েছিল ৪৬নং পাঞ্জাবী রেজিমেণ্টের সঙ্গে। এই রংরুটদের শিক্ষা দেবার জন্যে নিযুক্ত হ'ন একজন ভারতীয় অফিসার এবং কয়েকজন নন্-কমিশন্ড্ অফিসার। এঁরা সবাই বাঙালী যুবকদের বিশেষ যত্ন করতেন। বাঙালী যুবকেরা পাঞ্জাবী এন্-সি-ওদের 'গুরুজী' ব'লে সম্বোধন করত। আর তাঁরাও শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের শিক্ষক হয়েছিলেন ব'লে নিজেদের বিশেষ গৌরবান্বিত ব'লে মনে করতেন। তাঁরা জানতেন যে এই সব যুবকেরা শুধু এগারো টাকা মাইনের 'নোকরি' করতে আসেনি। সেই সময় পল্টনের সেপাইদের মাইনে ছিল এগারো টাকা ক'রে। এই টাকার মধ্যে প্রত্যেকের খাওয়ার খরচ চালাতে হ'ত। মাসের শেষে হিসেব ক'রে পল্টনের বেনিয়া প্রায় সবই কেটে নিত। বেনিয়ার দোকান ছিল ছাউনির ভিতরেই। পল্টনের

ডাল, আটা, ময়দা, ঘি, তেল, মসলা, মাংস, কাঠ ইত্যাদি এই বেনিয়া সরবরাহ করত।

বাঙালী রংরুটরা প্রথম মাসের মাইনে এক এক জন দুআনা থেকে দেড় টাকা পর্য্যন্ত পেয়েছিল! তা ছাড়া বাংলাদেশ ছেড়ে গেলেও বাংলাদেশ আমাদের ভুলতে পারেনি। তখনও লেডিজ্ কমিটি আমাদের জন্যে নানা রকম জিনিষ পাঠাতেন। তাতে আমাদের অনেক সুবিধা হ'য়েছিল। অনেক যুবকের বাড়ি থেকেও টাকা আসত। যাই হোক, এগারো টাকার বন্ধন থেকে আমরা শীগগিরই মুক্তি পেয়েছিলাম, কারণ শেষকালে আমাদের খাওয়াটা বিনামূল্যেই ব্যবস্থা হয়েছিল। খবরের কাগজের স্কুল-শিক্ষকদের জন্য বিজ্ঞাপনে যেমন লেখা হয় আ বা ফ্রী (অর্থাৎ আহার বাসস্থান ফ্রী) আমরাও সেই রকম আ বা ফ্রী হয়ে মহা আনন্দে টাকা জমানোর সুযোগ পেয়েছিলাম, যদিও টাকা কিছুই জমেনি।

প্রথম প্রথম বাঙালী যুবকেরা নিজেদের মধ্যে পালা ক'রে রান্না করত। মশকে ক'রে পাতকুয়ো থেকে জল তুলে আনত, হাত পুড়িয়ে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়ে মোটা মোটা চাপাটি বা হাতরুটি তৈরী করত। ধোঁয়ার ছলনে কেঁদে তৈরী এই রকম আধপোড়া রুটি খেয়ে যে কি আনন্দ পেতাম তা আর কি বলব। সেই অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে তখন "ধোঁয়ার ছলনে কাঁদা" কথাটার উপরেই সন্দেহ হয়েছিল। মনে হ'ত প্রেমিকা বিরহ সহ্য করেও যখন কাঁদতে পারছে না, অর্থাৎ

চেষ্টা ক'রেও যখন চোখে জল আসছে না, তখন ছল ক'রে ধোঁয়ার কাছে গিয়ে বসত। লোককে দেখাত যে সে সত্যিই কাঁদছে। প্রত্যেক সপ্তাহে এক একটি যুবকের দল এসে 'চিত্রল' লাইনের ব্যারাকগুলি জমিয়ে তুলত। আমরা সামরিক শিক্ষার অ, আ, ক, খ, অর্থাৎ অ্যাটেন্‌শন, লেফ্‌ট্‌ টার্ণ, রাইট্‌ টার্ণ, অ্যাবাউট টার্ণ, হল্‌ট্‌, মার্ক টাইম, কুইক মার্চ, ডাব্‌ল্‌ মার্চ এবং স্যালিউট প্রভৃতি শিখতে লাগলাম। ক্যাপটেন বীডল, ক্যাপটেন প্যাজেট, পাঞ্জাবী জমাদার ও এন-সি-ওরা অতি যত্নের সহিত আমাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। ৪৬নং পাঞ্জাবী রেজিমেণ্ট আমাদের সামরিক জীবনের প্রথম গুরু হলেন। আমরা মনে-প্রাণে খাটতে লাগলাম। এমনকি প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে ফিরে ব্যারাকে এসেও আবার প্র্যাকটিস্‌ করতাম। ব্যারাকের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যেত--রাইট টার্ণ, লেফ্‌ট্‌ টার্ণ শুনতে শুনতে কান মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করত। এমন হয়েছিল যে কেউ কেউ স্বপ্নের ঘোরেও রাইট টার্ণ, লেফ্‌ট্‌ টার্ণ বলে চেঁচিয়ে উঠত।

রাতে দুইজন করে রংরুট্‌ এক একটী ব্যারাকের চারিধারে পাহারায় নিযুক্ত থাক্‌ত। বন্দুক তখনও আমরা পাইনি কাজেই হাতে একটী করে মোটা লাঠি বন্দুকের বদলে দেওয়া হ'ত। গায়ে আমাদের থাক্‌ত দুম্বার ছালের ওভারকোট ও টুপী। সেই ছালের পশমের অংশ কোট ও টুপীর ভিতর দিকে থাকার দরুণ শরীর বেশ গরম থাক্‌ত। চারিদিক নিস্তব্ধ —শুধু সেন্‌ট্রীদের বুটের শব্দ ও মাঝে মাঝে চ্যালেঞ্জ

(Challenge) করবার ধ্বনি শুনতে পাওয়া যেত। দূরে পাহাড়-গুলিকে অন্ধকারে বিরাট দৈত্যের মত মনে হতো। রাতে সেনট্রীরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকৃত--তার একটা বিশেষ কারণ ছিল—আফ্রিদিরা প্রায়ই রাতে দুম্বা অথবা ভেড়ার ছাল গায়ে জড়িয়ে চুপিচুপি হামাগুড়ি দিয়ে এসে সেনট্রীদের পিছন হতে আক্রমণ করে তাদের বন্দুক কেড়ে নিয়ে সেই অন্ধকারে পালিয়ে যেত। সেইজন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সমস্ত স্থানে পাহারা দেবার সময়ে প্রত্যেক সৈনিকের কোমরে বেল্টের সঙ্গে শিকল (Chain) দিয়ে বন্দুক বাঁধা থাকে।

এইভাবে ক্রমেই আমরা সামরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলাম। প্রত্যেক বিষয় তন্ন তন্ন ক'রে 'গুরুজী'দের কাছ থেকে জেনে নিয়ে সেটা আয়ত্ত করতাম। প্রত্যেকদিন সকালে কিছু জলযোগ করে খাকি শর্ট (হাপ প্যাণ্ট) তার উপর গরম গেঞ্জি ও বুটপট্টি ইত্যাদি প'রে খালি মাথায় প্যারেড গ্রাউণ্ডে দু এক চক্কর দৌড়ে আসতাম। যখন শরীর বেশ গরম হ'য়ে উঠত তখন এক একটি টুলি বা স্কোয়াড্ এ ভাগ হ'য়ে এক একজন পাঞ্জাবী হাবিলদারের অধীনে প্যারেড করতে হ'ত। ভীষণ শীত, একজায়গায় চুপ ক'রে দাঁড়াবার উপায় নেই, হাত পা ছুঁড়লেই মনে হ'ত আরাম পাচ্ছি; কনকনে হাওয়া, হাতের আঙুল যেন জমে যেত, সোজা করতে কষ্ট হ'ত, হাতের চামড়া ফেটে রক্ত পড়ত। সন্ধ্যাবেলাটা আমাদের বেশ আনন্দে কাটত। দিনের সমস্ত ক্লান্তি ভুলে আমরা গান বাজনা অভিনয় আবৃত্তি

প্রভৃতিতে চিত্রল লাইনের ব্যারাকগুলো আনন্দে মাতিয়ে তুলতাম। ছেলেদের আর এক গুরুদেব হয়েছিল বিমল সিংহ। বিমল সিংহ চার্লি চ্যাপলিনের মত আমাদের মধ্যে কৌতুক অভিনয় করত। এই গুরুদেবের একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে যতই গম্ভীব প্রকৃতির লোক হোক না, তার কৌতুক অভিনয় দেখে না হেসে থাক্‌তে পারত না। তাব সাধারণ কথাও ছিল মজার। তার প্রভাত সঙ্গীত ও কীর্ত্তনের কথা আমরা কখনও ভুলতে পারব না।

আর একটা মজার ব্যাপার হত। মজাটা অবশ্য আমাদের উপর দিয়েই হ'ত—এবং তাব মধ্যে যেটুকু মাধুর্য্য সেটুকুর অংশ আমরা যে ভোগ করতে পারিনি সে কথা মজাটি শুনলেই পাঠক পাঠিকা বুঝতে পারবেন। ব্যাপারটা হচ্ছে প্যারেড। সাধারণ প্যারেড নয়, কুইনিন প্যারেড। হাঁসপাতালের সামনে আমাদের লাইন বেঁধে দাঁড়াতে হ'ত, আর একটা মস্ত বড় বোতলে কুইনিন মিক্‌শ্চার এনে হাঁসপাতালের লোকেরা প্রত্যেকের মুখে মেজার গ্লাসে ক'রে ঢেলে দিত। মাত্রাটাও যেন ঠিক মিলিটারী। তখনকার মুখভঙ্গির যদি কেউ ফোটোগ্রাফ তুলে রাখত এবং তাই দেখিয়ে নূতন সেনা রিক্রুট করতে হ'ত তা হ'লে সেনাদলে ঢুকতে কেউ সাহস পেত কি না সন্দেহ। সে একটা টিকিট ক'রে দেখবার মত দৃশ্য। দুঃখের বিষয় ঐ বিকৃতি মুখভঙ্গি দেখে হাসবার লোক ছিল না—অন্তত আমরা যে হাসতে পারিনি সে কথা বলাই বাহুল্য। মুখ থেকে যে মিক্সচার ফেলে দেব সে উপায় ছিল না—সামনেই এন সি-ওরা পাহারা দিত। যে এই

রকম দুঃসাহস দেখাত তার আর রক্ষা ছিল না, ডবল মাত্রা খেতে হ'ত। এ ছাড়া নানা রকম ভ্যাক্সিন-ইনজেকশনের পর্ব্ব পল্টনে প্রায় লেগেই থাকত। হায় রে সেই সব আনন্দের দিনগুলি! এত বিধিনিষেধ নিয়মকানুন, তবু আমাদের ছিল অপরিমেয় আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা। সব কিছুতেই আমরা উল্লাসিত হয়ে উঠতাম, কোনো বিষয়েই কখনও দ'মে যাইনি।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে অনাদিনাথ চ্যাটার্জি, কুমার অধিক্রম মজুমদার, জগদীশ বর্দ্ধন, দুর্গাপদ ব্যানার্জি, ধীরেন সেন, অরুণকুমার মিত্র, প্রকৃতিকুমার ঘোষ, বিমল সিংহ, তারক, শচীন রায়, জীতেন সরকার ও বীরেশ্বর মুখার্জি ল্যান্সনায়েকের পদগৌরব লাভ করলে। এদিকে দলে দলে কলকাতা থেকে বাঙালী যুবকেরা এসে রংরুটের সংখ্যা বাড়াতে লাগল; এদের এক একটি ছোট ছোট দলে ভাগ ক'রে উক্ত বাঙালী ল্যান্স-নায়েকদের অধীনে শিক্ষার ভার দেওয়া হ'ল। অল্পদিনের মধ্যেই প্রত্যেক যুবক সামরিক জীবনের সব রকম দুঃখ কষ্ট আনন্দের সঙ্গে সহ্য ক'রে সেনাজীবনের ঘোরতর দায়িত্বের পথে এগিয়ে চলতে লাগল।

ডাব্‌ল্‌ কম্পানির অফিসার হয়ে এসেছিলেন লেফ্‌টন্যাণ্ট এস, জি, টেলর। তাঁর মত অমায়িক এবং মহৎহৃদয় আমি কমই দেখেছি। তিনি বাঙালী ডাব্‌ল্‌ কম্পানির জন্যে যথেষ্ট খেটেছিলেন। ডাব্‌ল্‌ কম্পানির যুবকেরাও তাঁকে কোনদিন ভুলতে পারবে না। সেদিনের অনেক অস্পষ্ট স্মৃতির মধ্যে তাঁর স্মৃতিটি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে।

১৯১৬ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখটি বাঙালী ডাবল্ কম্পানির পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই তারিখে একটি দলকে "বেল-অ্যাট-আর্ম্‌স্" করা হ'ল। অর্থাৎ সেইদিন তারা প্রাথমিক শিক্ষায় যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পেল। সেদিন বোধ করি কোহিনুর মণিও আমাদের হাতে এলে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতাম। কি আনন্দই হয়েছিল সেদিন বন্দুক হাতে পেয়ে।

কিছুদিন পরে আমাদের মধ্যে এলেন শ্রীযুক্ত শৈলেন বোস। (ইনি হচ্ছেন মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বোস মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র)। মিলিটারি সেক্রেটারি জেনারেল্ বিঙ্‌লে সিমলা থেকে বোস্‌কে সোজা জমাদার করে এখানে পাঠান। জমাদার বোস বাঙালী পল্টনের জন্য যথেষ্ট কাজ করেছিলেন। তিনি পরবর্ত্তীকালে বেঙলী রেজিমেণ্টের সুবেদার মেজর পদে উন্নত হয়েছিলেন। তিনি সর্ব্বত্রই বিশেষ প্রশংসাজনক কাজ করেছিলেন, এবং সেজন্য তিনি 'বাহাদুর' এবং আই, ডি, এস, এম, (ইণ্ডিয়ান ডিস্টিংগুইষ্‌ট সার্ভিস মেডাল) এই সামরিক পারিতোষিকে ভূষিত হয়েছিলেন।

২৬শে নভেম্বর তারিখে বাঙালী ডাবল্ কম্পানি পূর্ণ হয় সুতরাং এই দিন শ্রীযুক্ত মল্লিকের সাধনা সফল হয়।

যদিও ডাবল কম্পানি গঠন সম্পূর্ণ হয়েছিল তবু বাংলা দেশ থেকে দলে দলে রংরুট নৌসেরাতে আসতে লাগল। যদি বাঙালী যুবকেরা সৈনিক হবার উপযুক্ত না হত তাহলে এইখানেই
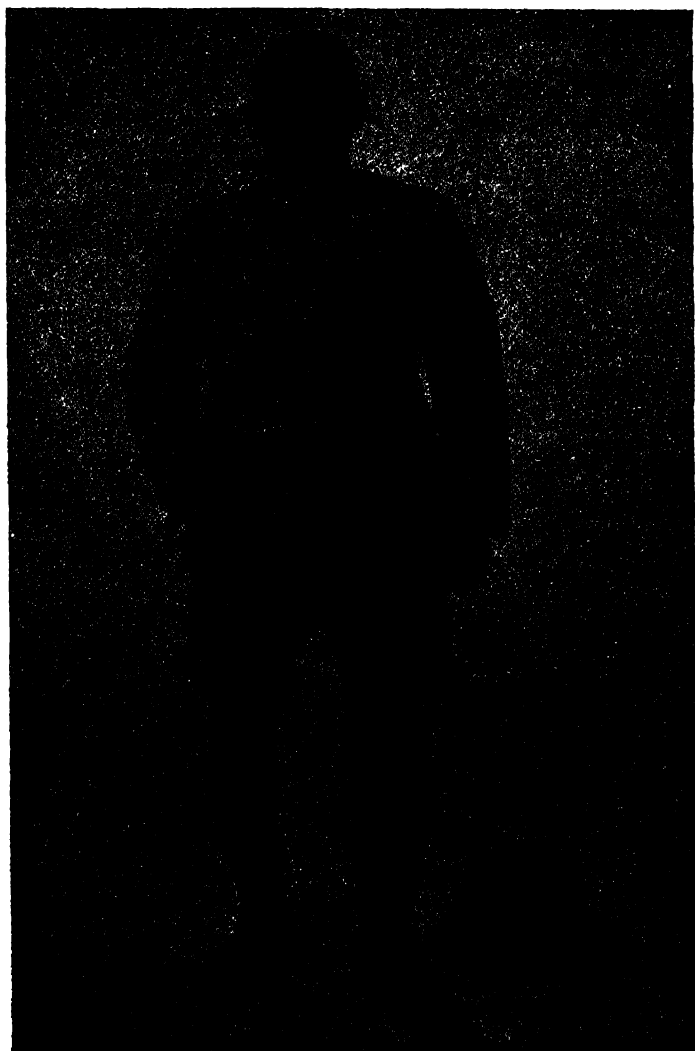
:সুবেদার মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বোস "বাহাদুর" আই, ডি, এস, এম

রংরুট সংগ্রহ বন্ধ করে দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এদের দিয়ে কাজ করান হত।

আমাদের সামরিক শিক্ষা খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। নভেম্বর মাসে ডাক্তার এস, কে, মল্লিক যখন ৪৬নং পাঞ্জাবী রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল সি, এইচ, মক্‌লারকে চিঠি লিখেছিলেন—বাঙালী যুবকেরা কি রকম কাজ করছে জানতে চেয়ে—তার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন—

"In regard to your question concerning the progress of the men, I can certainly say that it should be rapid if they continue the efforts which they appear to be making at present.

The general level of intelligence is high. The conduct of the men excellent.

There is very reason to believe that the majority will be by the end of their training at a fair level of efficiency in point of marching power in the plains. I have not yet seen the men as hill-climbers. My general impression about the men is that they seem willing, well-behaved and anxious to do credit to their class.

"*The Bengalee*"

Wednesday, November, 8, 1916.

আমাদের প্যারেড করতে হ'ত সোমবার থেকে বুধবার এবং শনিবার, সকাল বিকাল দুবেলা। বৃহস্পতিবার সকালে হত রূট মার্চ। সঙ্গে থাকত পাঞ্জাবী পল্টনের ব্যাণ্ড। শুক্রবারে হ'ত অব্‌স্ট্যাক্‌ল্‌ প্যারেড ও জিমন্যাস্‌টিক ক্লাস।

এই অব্‌স্‌ট্যাক্‌ল্‌ প্যারেড কিন্তু স্কুল কলেজের রেস্‌-এর মত নয়। আমাদের করতে হ'ত বন্দুক নিয়ে কোন উঁচু জায়গা, নালা, কোন বড় পাথরের স্তূপ, কোথাও বা কাঁটাতারের বেড়া, কোথাও বা ট্রেঞ্চ বা উঁচু দেয়াল টপকানোর কাজ। এইভাবে নানা বাধা অতিক্রম করে দৌড় অভ্যাসের নাম অব্‌স্‌ট্যাক্‌ল্‌ প্যারেড। এই দিনটা অনেকেরই চামড়া অক্ষত থাকত না। হাত পা প্রায় সবারই ছড়ে যেত। রবিবারটা আমাদের পূরো ছুটি থাকত। এই দিন এক একটা দল বেঁধে ক্যানটনমেণ্টের বাইরে ছোট ছোট পাহাড়ের উপর বেড়াতে যেতাম। আমাদের ব্যারাক থেকে কিছু দূরে একটি পাহাড়ের উপর মৃত সৈনিকদের নাম বুকে নিয়ে একটি মর্ম্মর স্মৃতিস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে গেলেই মনে হ'ত হয়ত একদিন আমারও নাম ঐ ভাবে কোন পাথরে খোদিত হ'য়ে থাকবে। দৈবক্রমে এ সৌভাগ্য আমার লাভ হয়নি, জীবনের অন্যান্য বহু আকাঙ্ক্ষার মত এটাও আজও অপূর্ণ ই রয়ে গেছে।

আমাদের কম্পানি ড্রিল, পিকেটিং, স্কাউটিং এবং রেঞ্জ-ফাইণ্ডিং ইত্যাদি শিক্ষার কাজ অল্প দিনেই শেষ হ'য়ে গেল। মাঝে মাঝে বাঙালী ডাবল্‌ কম্পানির সঙ্গে স্থানীয় পণ্টনদের যুদ্ধের মহড়া হ'ত।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজধানী, পেশোয়ার ও মারদান প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে, ফুটবল ম্যাচ খেলে আমাদের দিন গুলো বেশ কাটছিল। পূর্ব্বেই বলেছি আমরা সেখানে ছিলাম বর্ত্তমানকে নিয়ে। প্রায় দৈনিক কাগজের মতই আমাদেব জীবন।

আগাগোড়া আমাদের হৈ হৈ এবং উত্তেজনা। আমরা অত্যন্ত সাময়িক জীব, অতীতও নেই, ভবিষ্যতও নেই। যে কোন মুহূর্ত্তে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও কারো কোন দুঃখ নেই।

ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং নর্দার্ণ কম্যাণ্ড বাঙালী ডাব্‌ল্ কম্পানি দেখবার জন্য নৌসেরাতে এসেছিলেন। তিনি আমাদের দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সেজন্যে তিনি বিশেষ উপদেশপূর্ণ একটি বক্তৃতা দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছিলেন। তা ছাড়া আমাদের শিক্ষা যাতে ভাল রকম হয়, কোন দিকে কোন ত্রুটি না থাকে সে বিষয়েও বিশেষ বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন।

একদিন সকাল বেলা প্যারেড গ্রাউণ্ডে লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট টেলর এসে খবর দিলেন যে সিমলা দপ্তর থেকে সংবাদ এসেছে বাঙালী ডাব্‌ল্ কম্পানী করাচীতে বদলি হয়েছে। সেখানে ১৬নং রাজপুত পল্টনের সঙ্গে শিক্ষার জন্য থাকতে হবে। সুতরাং ২৯শে ডিসেম্বর আমাদের প্রথম শিক্ষাক্ষেত্র নৌসেরা ত্যাগ করে যেতে হবে। এই সংবাদে আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু নৌসেরা ছাড়তে যে কিছু কষ্ট হয়েছিল এবিষয়েও সন্দেহ নেই। বন্ধন যেখানেই হোক, সেই বন্ধন কাটান সব সময় খুব সহজ হয় না। বাইরের উচ্ছ্বাসে তা চাপা পড়লেও ভিতরে ভিতরে তার টান চলতে থাকে। এই টানে যে পিছিয়ে পড়ল তাকেই বলি আমরা দুর্ব্বল। আমরা সে দৌর্ব্বল্য ত একবার কাটিয়ে এসেছি।

নৌসেরা ছাড়বার সময় সব চেয়ে দুঃখ অনুভব করেছিলেন পাঞ্জাবী জমাদার ও হাবিলদারগণ। কোন সেনাদল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলি হবার সময় যে কি কাণ্ড হয় তা যে না দেখেছে সে ছাড়া আর কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিজেদেব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চিত্রল লাইন থেকে মার্চ ক'বে স্টেশন অভিমুখে রওনা হ'লাম! ষ্টেশন পর্য্যন্ত যে আমাদেব মার্চ ক'রে যেতে হল এই দৃশ্যটি আমাব কাছে রোমাঞ্চকব মনে হয়েছিল। মনে এমন একটা আনন্দ শিহরণ জেগেছিল—মনে হয়েছিল বাঙালীজাতির সৈনিক-জীবনের অগ্রদূতরূপে আমরা চলেছি নূতন পথ তৈরী করে—পথের বাধা দূর কবে, তাদের জন্যে পথ সুগম করে দিয়ে। এর পর থেকে সৈনিক-জীবন বাঙালীর কাছে আব স্বপ্ন বলে মনে হবে না।

২৯শে ডিসেম্বর ১৯১৬, আমাদেব প্রথম সামরিক শিক্ষা-মন্দির ও গুরুজীদের কাছ থেকে বিদায় নেবার তারিখ।

লাহোর ষ্টেশনে আমাদের জন্য স্পেশাল ট্রুপ্‌স্ ট্রেন-এর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ট্রেনখানা যখন কোনো ষ্টেশনে থামত তখন ভারি একটা মজার ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। ষ্টেশনে যে সব ফিরিওয়ালা থাকত তারা আমাদের দেখলেই তাদের যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে ষ্টেশনের বাইরে পালিয়ে যেত। কি জানি সাবধানের মার নেই—বলা ত যায় না, সেপাই লোক—ওদের অসাধ্য কিছু নেই, হয়ত সব জিনিষ কেড়ে খাবে এবং দাম দেবে না! এইটেই সম্ভবতঃ ছিল তাদের ধারণা। কিন্তু আমাদেব বিশেষ

অসুবিধা হ'ত না কারণ কয়েকটী ষ্টেশনে আগে থেকেই রেষ্টুরেণ্টে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা ছিল। সবাই হৈ হৈ করে চলেছি—সত্যকার আনন্দ যে কি তা সেদিন যে রকম অনুভব করেছিলাম সে রকম আনন্দ জীবনে পূর্ব্বে কখনও করেছি বলে মনে হয় না। মনে হতে লাগল ট্রেনখানিও প্রায় তিন শতের উপর বাঙালী যুবককে নিয়ে সগর্ব্বে ছুটে চলেছে। ছোট একটী ষ্টেশনে গাড়ী থেমেছে—চারিদিক ধূ-ধূ কর'ছে—শুধু দুই একটী পায়ে চলার পথ মাঠের উপব দিয়ে দূরে গ্রামের দিকে চলে গেছে। কয়েকখানি টোঙাগাড়ী ষ্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্রপ্‌স্‌ট্রেণ কম্যাণ্ডার টেলার সাহেবের অনুমতিক্রমে সকলেই গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। আমি প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়িয়ে ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে গল্প ক'রছি, এমন সময় ঐ দেশীয় একবৃদ্ধ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন "মেরা লেড়কা আয়া ?" এই কথা কয়টী বলেই, আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। পরে ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে শুনলাম ঐ বৃদ্ধের একটী ছেলে যুদ্ধে গেছে শীঘ্রই ছুটীতে বাড়ী আসিবার কথা আছে। সেইজন্যই তিনি প্রত্যেকদিন প্রত্যেকটী ট্রেণের সময় ছেলের প্রতীক্ষায় ষ্টেশনে আসেন।

কিছুক্ষণ পরে আমাদেরও ট্রেণ সেই ষ্টেশন ছেড়ে রওনা হল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি সেই বৃদ্ধটীও মাঠের পথ দিয়ে টোঙা ক'রে গ্রামের দিকে ফিরে চলেছেন।

তৃতীয় পর্ব্ব

মরুভূমির স্টেশনগুলি পিছনে ফেলে ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসের ১লা তারিখে ভোর ৪টার সময় করাচী স্টেশনে এসে পৌঁছিলাম। নব বৎসরের তীরে হ'ল আমাদের শুভ পদার্পণ। সবই নূতন! নূতন বৎসর, নূতন দেশ, নূতন শিক্ষাক্ষেত্র, নূতন পল্টনের সঙ্গে নূতন বাঙালী ডাবল্ কম্পানির এই মিলনটি শুভ ব'লে মনে হয়েছিল।

১৬ নং রাজপুত পল্টনের একজন জমাদার ত্রিশজন সিপাহী, ব্যাণ্ড ও ত্রিশখানা খচ্চরের গাড়ি স্টেশনে এসে উপস্থিত হ'ল। আমরা 'ফল্ ইন্' করলাম—অর্থাৎ লাইন ধ'রে যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর রাজপুত পল্টনের কর্ণেল করাচীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গের দল এসে উপস্থিত হলেন। ডাবল্ কম্পানির কম্যাণ্ডার লেপ্টেন্যাণ্ট এস, জি, টেলর সামরিক ভঙ্গিতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে অভিনন্দন করলেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বাঙালী ডাবল্ কম্পানি পরিদর্শন করবার পর এই ব'লে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রেছিলেন—"Bengal Volunteers, I heartily welcome you in my Brigade in this happy New Year." অর্থাৎ "বাঙালী ভলান্টিয়ারগণ, আমি আমার ব্রিগেডে নব বৎসরে আপনাদের আন্তরিকভাবে স্বাগতম্ করছি।"

লেপ্‌টেন্যাণ্ট টেলর হুকুম দিলেন, "ফর্ম ফোর্‌স্ রাইট্—বাই দি রাইট—কুইক্ মার্চ।" সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখা গেল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল একটি রাস্তার মোড়ে ঘোড়ার উপর ব'সে আমাদের মার্চ দেখছিলেন আমরাও চলতে চলতে তাঁকে অভিবাদন জানালাম। আইজ্ রাইট, আইজ্ ফ্রণ্ট (Eyes Right, Eyes Front) তারপর শহরের নানা পথ দিয়ে মার্চ করে প্রায় এক ঘণ্টা পরে রাজপুত ছাউনিতে এসে উপস্থিত হ'লাম। যাবার সময় অসংখ্য লোক রাস্তার দুধারে জমা হ'য়ে আমাদের দেখছিল, তা দেখে আমাদের বুক আনন্দে এবং গর্ব্বে ভ'রে উঠছিল।

আমাদের জন্য ৩টি বড় বড় ব্যারাক নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমাদের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ব্যারাকে রাখা হ'ল। সেইদিনকার মত রাজপুত পল্টনের অতিথি হ'য়ে কাটালাম।

রাজপুত পল্টনের কর্ণেল ডাব্‌ল্ কম্পানির যুবকদের শিক্ষার জন্য অতি সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন—নিজের পল্টন থেকে ভারতীয় অফিসার এবং এন্-সি ও নিযুক্ত করেছিলেন। স্থানীয় ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট থেকেও ভাল ভাল সারজেণ্ট ইন্‌স্ট্রাকটার, নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথমেই বাঙালী এন-সি-ওদের জন্য স্পেশাল ইন্‌সট্রাক্‌শনস্ ক্লাস ক'রে দিলেন। তারা রাজপুত এন-সি ও ও সার্জ্জেণ্টদের অধীন বিউগ্‌ল্ ও সিগ্‌ন্যালিং শিখতে লাগল। এদিকে এক একটি সেক্‌শন ভাগ ক'রে একজন হাবিলদার এবং চার পাঁচটি সেকশনের উপর একজন সার্জ্জেণ্ট ইন্‌স্ট্রাক্টর শিক্ষা

বেঙ্গলী ডাব্‌ল কম্পানি

পুরোভাগে লেফ্‌টেন্যান্ট এস্‌, জি, টেলার ও জমাদার শৈলেন বোস।

দিতে লাগল। এইভাবে সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যেই 'সেক্‌শন' থেকে 'প্ল্যাটুন', 'প্ল্যাটুন' থেকে 'কম্পানি ড্রিল', রাইফল্‌ এক্সারসাইজ, 'ফিজিক্যাল প্যারেড, বেয়নেট্‌ ফাইটিং 'মাস্কেট্রি ড্রিল' ইত্যাদি বিষয়ে সবাই পারদর্শিতালাভ করলে। করাচীতে সকাল ৬টার সময় আমাদের প্যারেড আরম্ভ হ'ত। প্রতি বৃহস্পতিবার 'কম্পানি ড্রিল' হ'ত, বিকেলের দিকে প্যারেড হ'ত না। সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও শনিবার দুবেলাই হ'ত। রবিবার দিনটা থাকত পুরা ছুটি। সেইদিন আমরা দল বেঁধে শহরের নানাস্থানে বেড়াতে যেতাম। আমরা যখন করাচীতে ছিলাম, তখন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় লোক ছিল—কেউবা ছিল পার্সী, কেউবা ছিল সিন্দী, কেউবা ছিল গুজরাটি। তাদের কেউ কেউ আমাদের প্রায় নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াত।

১০ই জানুয়ারি বম্বের গভর্ণর লর্ড উইলিংডন বাঙালী ডাব্‌ল্‌ কম্পানি পরিদর্শন করেন। তিনি বাঙালী ডাব্‌ল কম্পানির অফিসার, এন্‌-সি-ও এবং রংরুটদের দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হ'য়েছিলেন, তাদের প্যারেড দেখেও বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন।

গভর্ণরের পরিদর্শন করার কিছুদিন পরেই বাঙালী ডাব্‌ল্‌ কম্পানিকে গুর্খা সৈন্যদের মত টুপি (ফেল্ট হ্যাট্‌) দেওয়া হয়েছিল। জানুয়ারির শেষ ভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় সেক্‌শনকে চাঁদমারী বা 'রেঞ্জ ফায়ারিং' (গুলি ছোঁড়া এবং লক্ষ্যভেদ) শেখান আরম্ভ হ'ল। প্রত্যেকদিন ভোর ৫টার সময় কিছু
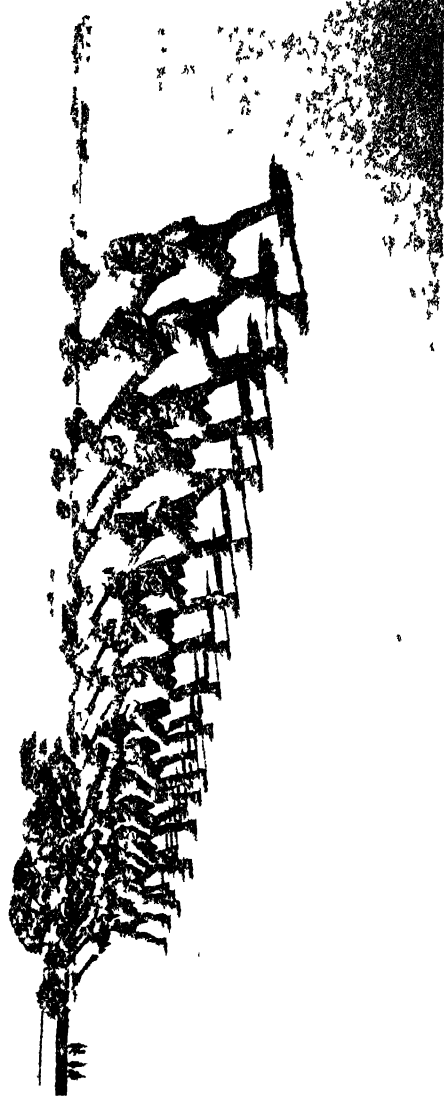
বেঙ্গলী ডাব্‌ল কম্পানির একটী সেকশন বেয়নেট্‌ ফাইটিং প্র্যাক্‌টিস্‌।

জলযোগ ক'রে বন্দুক, সতরঞ্চি, নিশান (ফ্ল্যাগ), গুলির বাক্স প্রভৃতি কাঁধে নিয়ে ব্যারাক থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে মার্চ ক'রে চাঁদমারীতে যেতে হ'ত। ফায়ারিং শেষ হবার পর ব্যারাকের দিকে মার্চ ক'রে আসতাম। মার্চ করবার সময় আমরা একটা গান গাইতাম। কুমার অধিক্রম মজুমদার, তার লম্বা দুটি হাত দুলিয়ে গানের সঙ্গে সঙ্গে হোঃ হোঃ লেফট্ রাইট্ লেফট্ রাইট্ বলে চিৎকার করে উঠতো, এখনও আমার মনের মধ্যে স্বপ্নের মতন ভেসে ওঠে। এই গানটিতে যে কাব্যসম্পদ এবং ভাষামাধুর্য্য আছে সে বিষয়ে পাঠক মাত্রেরই মতভেদ থাকবার কথা নয়। অর্থাৎ সে সব কিছুই এতে নেই। কোন সাধক কবির দেহতত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক গানও এ নয়। অথচ এই গানটিই সেদিন আমাদের মার্চ ক'রে পথ চলবার সময় কত আনন্দই না দিয়েছে!—গানটি এই—

ক্যারাসিনের ত্যাল।
আহাগুন দিলে জ্বলেরে ভাই
ক্যারাসিনের ত্যাল।
দেখতে লাগে পানির লাহাল
আহাগুন দিলে জ্বলেবে ভাই
ক্যারাসিনের ত্যাল।
বাতের ব্যারাম হুলি পরে
মাহালিস করলে সারেরে ভাই
ক্যারাসিনের ত্যাল।
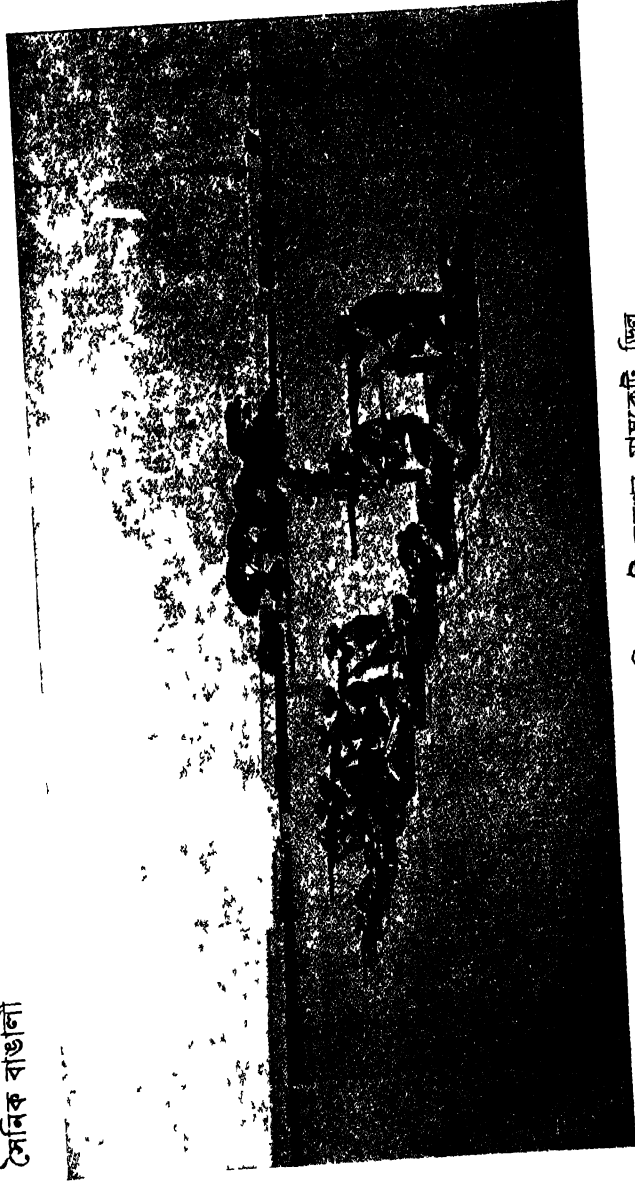
বঙ্গলী ডাব্ল কম্পানির একটি সেক্শন, মাস্কেট্রি ড্রিল

এই গান মনের যে অবস্থায় ভাল লাগে সেটা হচ্ছে মনের মুক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় যে কোন তুচ্ছ উপলক্ষেই মন খুশী হ'য়ে উঠতে পারে।

ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ১৬নং রাজপুত পল্টন মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেল। তাদের জায়গায় এলো ১০৬ নং হাজারা পাইওনিয়ার (106th Hazara Pioneer) সুতরাং আমাদের আবার এদের অধীনে থেকেই শিক্ষালাভ করতে হ'ল। এই হাজারা পল্টনের অধীন আরও দুটো সেকশন ক্রমে 'চাঁদমারী' পাস করলে। আমাদের মধ্যে যারা চাঁদমারীতে আগেই পাস করা ছিল তাদের কেবল 'কম্পানি ড্রিল' করাত। সেই সময় বাঙালী রংরুটদের অন্যান্য প্যারেড বাঙালী এন-সি-ও এবং ব্রিটিশ শিক্ষকগণ করাত।

একদিন ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার থেকে হুকুম এল যে যারা চাঁদমারী পাস ক'রেছে তাদের শপথ গ্রহণ ক'রতে হবে। এই শপথের ইংরেজী নাম অ্যাটেস্টেশান, Attestation.

কুচকাওয়াজ ও লক্ষ্যভেদ প্রভৃতি শিক্ষা শেষ হবার পর প্রত্যেক রংরুটকে রাজার পতাকা স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ ক'রতে হয়। এইদিন থেকে রংরুট নাম ঘুচে গিয়ে সিপাহি নাম হয়। শপথটি এই—

"I shall be faithful to His Majesty, His Heirs and Successors—That I shall serve in His Majesty's Indian Forces going wherever I am ordered by land and sea

and that I will obey all commands of any officer set over me even to the peril of my life. So help me God."

এর মোটামটি অর্থ এই—

"আমি রাজার প্রতি, এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তের প্রতি বিশ্বস্ত রহিব। স্থলপথে বা জলপথে যেখানেই আদিষ্ট হইব সেইখানেই যাইব, এবং রাজার ভারতীয় সৈন্যদলে কাজ করিব, এবং জীবনপাত করিয়াও, আমার প্রতি কোন অফিসার যে আদেশ দিবেন, তাহা পালন করিব। ঈশ্বর আমার সহায় হউন।"

এই শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানটিকে "অ্যাটেস্‌টেশন সেরিমনি" বলে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের অনুমতি নিয়ে আমরা বাংলা ভাষাতে এই শপথ গ্রহণ করেছিলাম। পৌরোহিত্যের কার্য্য করেছিলেন জমাদার শৈলেন বসু। শপথ গ্রহণ করবার পর বাঙালী সিপাহীরা শুধু 'কম্প্যানি ড্রিল' এবং 'সেন্ট্রি ডিউটি' কর্‌তে লাগল। এদিকে প্রত্যেক সপ্তাহে বাংলা দেশ থেকে নূতন নূতন রিক্রুট আস্‌তে লাগল। এই সব নবাগত রিক্রুটদের শিক্ষক হয়েছিলেন হাবিলদার জগদীশ বর্দ্ধন। কারণ হাবিলদার বর্দ্ধন এই সব রিক্রুটদের অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে অল্পদিনের মধ্যে সিপাহী হবার মত উপযুক্ত করে তুল্‌তে পারতেন। এই সব রিক্রুটরা এক একটি বাঁশ নিয়ে রাইফেলের মত প্রাক্‌টিস কর'ত। আমরা ঠাট্টা করে এই সব রিক্রুটদের নাম রেখেছিলাম "Bardhan's Bamboo Battalian."

তারপর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ১০৬ নং হাজরা পাইওনিয়ার মেসোপটামিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেল। এইবার তাদের জায়গায় এল ১১৬নং মারহাট্টা (116th Marhattas)। কিন্তু দেখা গেল এই রেজিমেণ্টের অধিকাংশই বাঙালী রিক্রুটের মত।

একদিন ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার থেকে হুকুম এল বাঙালী ডাবল্ কম্পানিকে করাচীর সমস্ত বড় বড় জায়গায় অর্থাৎ ব্যাঙ্ক, পোর্ট, ইণ্ডোপার্সিয়ান টেলিগ্রাফ লাইন, এয়ারোড্রোম, করাচী হেড কোয়ার্টার্স টেলিফোন লাইন প্রভৃতি গার্ড দিতে হবে। অর্থাৎ আমাদের সৈন্য-জীবনের কাজ প্রায় এখন থেকেই সুরু হয়ে গেল। এই সব কাজ আমরা আন্তরিকভাবেই করেছিলাম। এ জন্যে করাচীর সামরিক অফিসারদের কাছে আমরা খুব প্রশংসাও লাভ করেছিলাম।

এরপর আরও আনন্দ হ'ল যখন শুনলাম বাঙালীরা পৃথক ভাবে একটি পল্টন ব'লে গণ্য হবে। সংবাদটা এল ১৮ই এপ্রিল তারিখে—দিল্লী আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে। এতদিন পরে ডাবল কম্পানি সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে সত্যি সত্যিই ভারত সম্রাটের ভারতীয় পল্টনের মধ্যে একটি আসন লাভ ক'রলে। তবে পল্টন তখনও কোন নম্বর দ্বারা চিহ্নিত না হ'লেও "বেঙ্গলী ব্যাট্যালিয়ন" নামে ভূষিত হ'ল এবং প্রত্যেক সৈনিক "Bengalis" 'বেঙ্গলীজ' নাম খোদিত একটি করে 'ব্যাজ' বা চিহ্ন ধারণ করলে।

একটি ব্যাটালিয়নকে কি ভাবে সাজাতে হয় তারই আয়োজন এখন থেকে চ'ল্‌তে লাগল। ডাব্‌ল কম্পানি থেকে অধিক্রম

বেঙ্গলী ডাবল কম্পানিব বৃটিশ ও ভাবতীয় অফিসাব ও এন-সি-ও গণ।

উপবিষ্ট বামদিক হইতে—হাবিলদাব জগদীশচন্দ্র বর্দ্ধন, হাবিলদাব কুমার অবিক্রম মজুমদার, লেফ্‌টেন্যাট এস, জি, টেলাব, মেজর ওয়ালার জমাদার শৈলেন্দ্রনাথ বোস, হাবিলদার অনাদিনাথ চ্যাটার্জ্জী, হাবিলদাব অরুণকুমাব মিত্র।

দণ্ডায়মান দ্বিতীয় পংক্তি—ল্যান্স নায়েক খলিলব বহমান, ল্যা না, শরৎকুমাব রায়, ল্যা না, বীবেশ্বর মুখার্জ্জী নায়েক বাজেন্দ্রলাল মুখার্জী, নায়েক ধীরেন্দ্রকুমার সেন, নায়েক বিমল সিংহ, ল্যা, না, জিতেন্দ্রনাথ সবকার, নায়েক তুর্গাপদ ব্যানার্জী।

দণ্ডায়মান তৃতীয় পংক্তি—ল্যান্স নায়েক প্রবোধ চক্রবর্ত্তী, ল্যা, না, ফণী লাহিড়ী, ল্যা, না, নাবায়ণচন্দ্র রায়চৌধুবী, ল্যা, না, তাবক ব্যানার্জী, ল্যা, না, রণদাপ্রসাদ সাহা, নায়েক প্রকৃতিকুমার ঘোষ।

মজুমদার, দুর্গাপদ ব্যানার্জি, প্রকৃতিকুমার ঘোষ (পটলা), প্রমথ সাঁতরা, রণদা সাহা, জিতেন সরকার এবং দুলাল হালদার প্রভৃতি এন-সি-ওদের 'মাস্কেট্রি' 'বেয়োনেট ফাইটিং' 'লিউইস গান' এবং 'বমিং'এব বিশেষ শিক্ষার জন্য সাতারা, পুনা, কোয়েটা এবং মায়ো প্রভৃতি সামরিক অড্ডায় পাঠান হয়েছিল। অনাদি চ্যাটার্জি, অমল গাঙ্গুলী ও নগেন ঘোষকে একটি প্ল্যাটুন নিয়ে ট্র্যান্সপোর্ট ট্রেনিং-এ পাঠান হল। এই শিক্ষাব বিষয় হচ্ছে খচ্চর ও খচ্চবের গাড়ী চালাতে শিক্ষা কবা। যুদ্ধক্ষেত্রে খাদ্য সামগ্রী, গোলাগুলি, মেশিনগান, তাঁবু প্রভৃতি বহন কবে নিয়ে যাবার পক্ষে এই ট্রান্সপোর্ট বিভাগ বিশেষ প্রয়োজন।

অল্পদিনের মধ্যে এই সব বাঙালী এন সি-ওবা প্রত্যেক বিষয়ে সুশিক্ষিত হ'য়ে এসে নিজেদের ব্যাটালিয়নের উন্নতি সাধন ক'র্তে লাগল। লেফ্টন্যাণ্ট টেলর কম্পানি কম্যাণ্ডার; লেফ্টন্যাণ্ট গিব্স্ কোয়ার্টার মাস্টার; জমাদার শৈলেন বোস সুবেদার; হাবিলদার অনাদি চ্যাটার্জি ও অধিক্রম মজুমদার জমাদার এবং নায়েক বিমল সিংহ কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার রূপে ব্যাটালিয়নে কাজ করতে লাগলেন।

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে দিল্লী আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে খবর এলো একটি প্ল্যাটুনকে রংরুট সংগ্রহ করবার জন্য বাংলায় পাঠাতে হবে। লেফ্টেন্যাণ্ট টেলর, হাবিল-দার ধীরেন্দ্রকুমার সেন, হাবিলদার অরুণকুমার মিত্র, হাবিলদার শচীন রায় প্রভৃতি পাস করা একদল সিপাহী নিয়ে কলকাতা

শ্রীযুক্তা শিশিবকুমারী মল্লিক
(মিসেস্ এস্. কে, মল্লিক)

অভিমুখে রওনা হলেন। আমিও ঐ দলে ছিলাম। বাঙালী সিপাহীরা পূরো দুটি মাস বাংলার প্রত্যেক জেলায় ও শহরে ঘুরে বেড়িয়ে রংরুট সংগ্রহ করতে লাগল। ডাক্তার মল্লিক, স্থরেন ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি বাঙালী নেতারা যে ভাবে বাঙালী যুবকদের অনুপ্রাণিত ক'রে তুলছিলেন তাতে বাংলার মাতৃজাতিও নীরব ছিলেন না। মিসেস এস, কে, মল্লিক, মিসেস কে, বি, দত্ত, মিসেস জে, এন, রায়, মিসেস এম, এল, মিত্র, মিসেস জে, সি, মুখার্জি, মিসেস এ, সি, দত্ত, মিসেস এ, পি, সেন, মিসেস পি, কে, রায়, ডাক্তার মিসেস গাঙ্গুলি, মিসেস এস, এন, হালদার, মিসেস চৌধুরী এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস মহাশয়ের পত্নী সরোজনলিনী দত্ত প্রভৃতি নেত্রী-স্থানীয়া মহিলাদের আন্তরিক উৎসাহে এবং উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে মহিলা সমিতি (লেডিজ কমিটি) গঠন ক'রে বাংলা থেকে বহু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা থেকে প্রায় সাত (৭০০০) হাজারের উপরে বাঙালী সৈনিকের দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযুক্ত বহু জিনিসপত্র নৌসেরা, করাচী ও মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন। দূর দেশে ব'সে স্নেহহীন রুক্ষ আবহাওয়ায় এই দান আমাদের মনকে কৃতজ্ঞতায় এবং আনন্দে অভিভূত ক'রে ফেলত। কিভাবে প্রথমে বেঙ্গলী ডাব্‌ল কম্পানির ছেলেদের সুখস্বচ্ছন্দের জন্যে মহিলা কমিটি কাজ আরম্ভ করেছিলেন। ১৯১৫-১৯১৮ সালের মহিলা সমিতির রিপোর্ট উদ্ধৃত করছি।

মহিলা কমিটি।

মিসেস জে, এন, রায়, মিসেস এম, এন, মিত্র, মিসেস পি, কে, রায়, মিসেস কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, মিসেস জে, সি, মুখার্জি, মিসেস এ, সি, দত্ত, মিসেস কে, বি, দত্ত, মিসেস এ, পি, সেন।

In September 1916, when the proposal for the Bengalee Double Company came befor the country, Mrs. S. K. Mullick suggested the idea of supplying necessities to these newly enlisted recruits. The Government paid very little and we found that some of the recruits being very poor had hardly the bare necessities with them. We dicided to try and work for this cause. A large and influential Ladies' Meeting was convened at the Mary Carpenter Hall, to interest every one in the work and an appeal was made for funds. We decided to give 11 little articles of necessity and pack them up in a small khaki bag and present each recruit with a bag as they left Howrah Station. We calculated that it would cost about Rs. 7/- per bag and the whole cost of the Double Company was estimated at Rs. 3000/-. At the meeting several generous hearted ladies came forward with help and advanced some monies to begin the work. We were rather doubtful about raising so much money, so we decided to appeal for funds in the papers. Within two months, we found that the generous response of our friends for this good cause, was beyond our expectations. Evidently the idea of our boys having an opportunity for Military training was welcomed by the rich and poor alike. We are thankful to our friends and well-wishers for many a large and small donation to help us forward with our work in hand. Our work had stirred the whole of Bengal and it is with unfeigned pride we have to record that we received such small

donations as Rs. 2, 3, 4 and 5, sent by money-orders from the remotest pallies and villages in Bengal. One money-order requires special mention, in which, the lady-remitter writes :—"I gave my little daughter Rs. 2/- for her birth-day but she wants me to send this towards the Bengalee Double Company Fund.

All donations towards this work have been fully published in the papers from time to time and a complete Report with accounts and vouchers have also been published in the form of a book. We shall not therefore go into details here, except mentioning a few facts which might interest our members and through them the general public. As our work in this department gradually increased, we formed a special sub-committee for this work and nominated Mrs. K. B. Dutt as the Secretary of the Sub-committee. At first and for one year Mrs. R. C. Dutt had lent us a room in her house in Hungerford Street for our work, but now we have our work-parties every Wednesday at Mrs. K. B. Dutt's place.

Thanks of the Samiti are due to the following ladies for their regular attendance on Wednesday's work—parties at Mrs. Dutt's place namely—Mrs. Suren Haldar, Mrs. B. L. Mitter, Mrs. P. Mukherjee, Mrs. J. N. Roy, Mrs. N. C. Banerjee, Miss. Dutt, Mrs. A. C. Dutt, Mrs. A. P. Sen, Mrs. J. C. Mukherjee and Dr. Mrs. Ganguly.

Early in 1918, we felt our funds were getting low and so we decided to have a fancy fair for the

purpose of raising money. Maharajah of Cossimbazar kindly lent us his grounds and we had a Fair in May 1918. We held the Fair for three days and realised more than Rs. 4000/-. Our grateful thanks are due to several gentlemen friends for kindly helping us with the arrangements for the Fair. Special thanks are due to Mrs. P. N. Bose and Mrs. B. L. Mitter for arranging the theatricals on the occasion which were a great success. Samiti is also grateful to Mrs. Mrigen Mitter, Mrs. J. N. Roy, Mrs. A. P. Sen, Mrs. Jotin Gupta, Mrs. B. L. Chowdhury, Mrs. N C. Banerjee, Mrs. K. B. Dutt, Mrs. A. C. Sen, Mrs. Gyan Roy and several other ladies special devotion made the Fair such a success. The Double Company has increased into 2 Battalions now—and our comforts are being sent both to Mesopotamia and Karachi. For our Karachi works, we have been getting Rs. 250/- from the Bengalee Patriotic Fund for the last six months. On an average our monthly expenditure is between 5 to 6 hundred for our boys in Mesopotamia. We get regular acknowledgments from the Commanding Officers as well as, from some of the Subadars and Havildars of the 49th Bengalees. Special thanks of the Samiti are due to Mrs. K. B. Dutt and the sub-committee for carrying on this work so successfully. In concluding this Report we cannot allow this opportunity to slip by without acknowledging with deep gratitude, the debt we owe to all our friends and wellwishers for

kindly helping us with donations. But for their generous help, Mahila Samiti could not have continued this work so satisfactorily and for so long. From September 1916 upto July 1918, we have collected Rs. 27,440-4-0 for our Bengalee Regiment work, and we have spent Rs. 19,876-15-0, our Bank Balance with Mrs. P. C. Chowdhury (our Special Treasurer for this fund) at the end of July 1918 is Rs. 7,563-5-0. It is a matter of great satisfaction to us, to feel to day, that we have been able to do our work of this Section so satisfactorily.

Published by
Mahila Samity
9/1, Hungerford Street, Calcutta.

মিস্টার এন, ঘটক (বর্ত্তমান মাস্টার কলিকাতা হাইকোর্ট) এবং মিস্টার জে, সি, মুখার্জ্জি (বর্ত্তমান কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ্ অফিসার) মিঃ বি, কে, লাহিড়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ রিক্রুটিং পার্টিকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

৮ই জুলাই করাচী থেকে কলকাতায় একটি টেলিগ্রাম এলো—Battalion under order of mobilization for active service. Return at once"—অর্থাৎ "ব্যাটালিয়ন যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্যে আদিষ্ট হয়েছে—অবিলম্বে ফিরে এস।" আমরাও করাচী অভিমুখে রওনা হলাম।

১৭ই জুলাই। করাচীতে পৌঁচেছি। ব্যারাকগুলো নতুন রংরুটে ভর্ত্তি হয়ে গেছে, তা ছাড়া ব্যারাকের আশেপাশে তাঁবু

খাটিয়ে উদ্বৃত্ত রংরুটদের আস্তানা হয়েছে। ঢাকার নবাব সাহেবও এই ভিড়ের মধ্যে রয়েছেন। তাঁরও বেতন মাসে এগারো টাকা! এখানে সব সমান। নবাব হয়েও সাধারণ সিপাহীর বেশে রাজাও দেশের জন্যে আমাদের মধ্যে এসেছেন। খুব আনন্দ হ'ল।

মিঃ জে, এন্, বোসের (এটর্নি) পুত্র স্থধীর বোস, মিঃ কে, বি, দত্তর (ব্যারিষ্টার) পুত্র শম্ভু দত্ত এবং বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীশিশির ভাদুড়ীর ভ্রাতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, ভূমেন রায়, শ্যাম চৌধুরী প্রভৃতি সকলে মিলে ব্যারাক মাতিয়ে তুলছেন!

এখানে আসতেই শুনলাম অরুণ মিত্র, দুর্গাপদ ব্যানার্জি, ধীরেন সেন, ভূপেন ঘোষাল, শরৎ রায় ও আমি জমাদার পদের জন্যে মনোনীত হয়েছি এবং আমাদের নাম উপরিওয়ালার কাছে পাঠান হয়েছে। শুনে আনন্দ হল, নিজের উপব শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। এখন থেকে আর বন্দুক ও ব্যাণ্ডোলিয়ার (কার্ট্রিজ রাখবার থলেশুদ্ধ বেল্ট, কাঁধের উপর দিয়ে হাতের নীচে ঝোলানো থাকে) বহন করতে হবে না, তার বদলে একখানি তরবারী, একটি রিভলভার, একটি, ক্রস্ বেল্ট ও কাঁধে ষ্টার থাকবে। লেফট্ন্যাণ্ট টেলর, জমাদার অধিক্রম মজুমদার, আমাদের ক'জনকে তাঁদের অভিনন্দম জানালেন। মেজর ভি, ভি, ভি, স্যাণ্ডিফোর্ড আমাদের পল্টনের কম্যাণ্ডার হয়েছিলেন—অ্যাডজুট্যাণ্টের কাজ করেছিলেন লেফট্ন্যাণ্ট টেলর এবং কোয়ার্টার মাষ্টার হয়েছিলেন লেফট্ন্যাণ্ট মনিজ্।

বাঙালী ব্যাটালিয়নকে এ-বি-সি-ডি এই চারিটি কম্পানিতে ভাগ ক'রে ব্রিটিশ ও ভারতীয় অফিসার এবং এন-সি-ওদের বিভিন্ন কম্পানিতে নিযুক্ত করা হল। আমি হলাম 'সি'-কম্পানির ভারতীয় অফিসার।

প্রথমদল ১৯শে জুলাই জমাদার অনাদি চ্যাটার্জ্জির অধিন ট্রান্সপোর্ট সেকশন 'ইসলামিয়া' জাহাজে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেল।

আমাদেরও যাবার দিন ঘনিয়ে এল। অডন্যান্স (সামরিক ভাণ্ডার) থেকে আমাদের পল্টনের যাবতীয় জিনিষপত্র জড়ো হ'তে লাগল। দু'তিন দিনের মধ্যেই ব্যাট্যালিয়নকে রণসজ্জায় সজ্জিত করা হ'ল। বন্দোবস্ত হ'ল—দুটি ব্যাচ বা দল ভিন্ন ভিন্ন দুই জাহাজে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ২৫শে জুলাই ও ৩০শে জুলাই রওনা হবে। বাঙালী যুবকদের আনন্দ আর ধরে না। তাদের সকল সাধনা যেন এতদিনে সফল হতে চল্‌ল। মৃত্যুর মুখে যাবার আনন্দ! অতি ভাবপ্রবণ কেউ কেউ নিজের হাতের রক্ত দিয়ে লিখে তাদের প্রিয়জনদের কাছে তাদের চির বিদায়বাণী পাঠিয়েছিল। কি নিষ্ঠুর তারা! একে চির-বিদায়-বাণী তার উপর আবার রক্ত দিয়ে লেখা। একবারও ভাবলে না এই বাণী রক্তের নয়, যাকে লেখা হ'ল তার হৃদয়ে সেটা ছুরির মত বিঁধবে এবং হৃৎপিণ্ড থেকে শোণিতধারা বয়ে যাবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলে যারা গিয়েছিল তাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

দ্বিতীয় দল, ২৫শে জুলাই ১৯১৭ "বান্দ্রা জাহাজ," মেজর অ্যাড্‌লারের অধীন—

ব্রিটিশ অফিসার

মেজর ভি, ভি, ভি, স্যাণ্ডিফোর্ড
ক্যাপটেন ওয়েবস্টার

ভারতীয় অফিসার

সুবেদার শৈলেন বোস
জমাদার, অরুণকুমার মিত্র
" মনবাহাদুর সিংহ (লেখক)

এ কোম্পানী	৫ প্ল্যাটুন
বি "	৪ "
সি "	২ "

এ ছাড়া কয়েকজন ক্যাম্প-ফলোয়ার বা অনুচর।

তৃতীয় দল—৩০শে জুলাই, ১৯১৭ "বরোদা জাহাজ"। মেজর এ, এল, ব্যারেটের অধীন—

ব্রিটিশ অফিসার

ক্যাপ্‌টেন ফ্রিট্‌জ্‌ হারবার্ট
" স্মিথ
" এমিজ
লেপ্টেন্যাণ্ট মনিজ
" টেলর
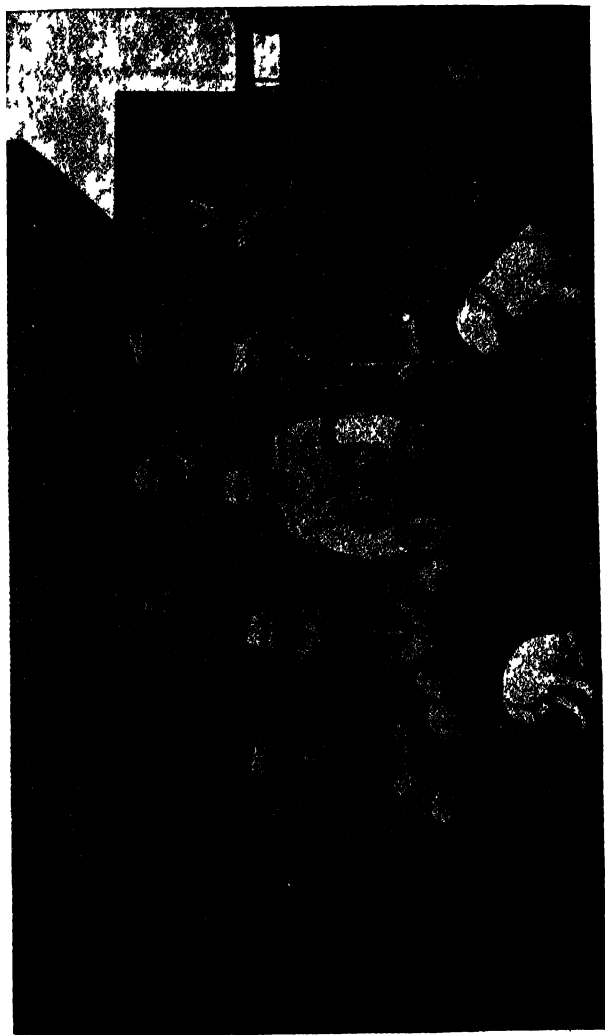
৪৯ সংখ্যক বেঙ্গলী বেজিমেণ্টেব কতিপয বৃটিশ অফিসাব।

উপবিষ্ট বামদিক হইতে—ক্যাপ্টেন এইচ, জোন্স, ক্যাপ্টেন ফিটজহাববার্ট, কর্ণেল ভি, ভি, ভি, সাণ্ডিদাড, মেজব জি, পিযাস, ক্যাপ্টেন ব্যাট। দণ্ডাযমান বামদিক হইতে—ক্যাপ্টেন ভি, গুপ্ত, আই. এম, এস, ক্যাপ্টেন গডন, ক্যাপ্টেন ব্রোমলি, লেপ্টেন্যাণ্ট ওযেষ্ট, লেপ্টেন্যাণ্ট ফোড।

ক্যাপ্‌টেন পিয়ার্স

লেঃ অ্যাটকিন্‌সন

" লং

" গিবস্‌

" হেই (মেডিক্যাল অফিসার)

ভারতীয় অফিসার

জমাদার কুমার অধিক্রম মজুমদার

" ধীরেন্দ্রকুমার সেন

" দুর্গাপদ ব্যানার্জি

" ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সাব অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন যোশি (মেডিক্যাল)

ডি কম্পানি ৪ প্ল্যাটুন

সি কম্পানি ২ "

বাদবাকী ক্যাম্প-ফলোয়ার বা অনুচর।

আমাদের চলে যাবার পব করাচী ডিপোর ইন্‌চার্জ্জ বা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী রইলেন ক্যাপটেন আর, ডি, ই, ডারেল, জমাদার শরৎকুমার রায়, কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার বিমল সিংহ।

পরবর্ত্তী কালে জমাদার শরৎকুমার রায় দম্‌দম্‌ ক্যাণ্টনমেণ্টে বদলি হ'য়েছিলেন এবং জমাদার রণদাপ্রসাদ সাহা করাচী ডিপোতে জমাদার রায়ের স্থানে কাজ করতে লাগলেন।

২৫শে জুলাই বঙ্গগৌরব নবীন সৈনিকদের চিরস্মরণীয় দিন! এই দিন আমরা সত্যিই কূলের বন্ধন ছেড়ে অকূলে ভাসলাম।

মেসোপটেমিযাব ৪৯ সংখ্যক বেঙ্গলী বেজিমেণ্টেব ভাবতীব অফিসাবগণেব একাংশ। দণ্ডাযমান বামদিক হইতে—জমাদাব যশোদাকিঙ্কব ঘোষ, জমাদাব শচীন্দ্রনাথ বাষ, জমাদাব নবাব বাহাদুব ঢাকা, সুবেদাব অনাদিনাথ চাটার্জি, জমাদাব প্রকৃতিকুমাব ঘোষ। মধ্যস্থলে উপবিষ্ট বামদিক হইতে—সুবেদাব হীবেন্দ্রনাথ সবকাব, সুবেদাব কুমাব অধিক্রম মজুমদার, সুবেদাব মনবাহাদুব সিংহ, সুবেদাব ফণীভূষণ দত্ত।

"এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে" যাত্রা খুব যে সহজ তা সে দিন কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিলাম।

৮টার সময় ব্যারাক থেকে মার্চ ক'রে বন্দর অভিমুখে রওনা হ'লাম। জেটিতে পৌঁছে দেখি আমাদের বাহন এস-এস (ষ্টীমশিপ) 'বান্দ্রা' প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'ফেটীগ্ পার্টি' বড় বড় তাঁবু, বন্দুক, গুলির বাক্স, খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি জাহাজে তুলছে। সহিসরা ব্রিটিশ অফিসারদের ঘোড়া সিঁড়ি দিয়ে জাহাজে তুলছে, 'এম্বারকেশন' এবং জাহাজের অফিসারগণ কাগজের ফাইল নিয়ে ছুটোছুটি করছে। ডাক্তার সাহেব সৈনিকদের একে একে নাড়ি টিপে ছেড়ে দিচ্ছেন। আমাদের বিদায় দেবার জন্য সে দিন জেটিতে আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল না, শুধু এসেছিলেন আমাদেরই পল্টনের অফিসার, সৈনিক এবং করাচীর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং মহিলা। আমরা যখন সবাই জাহাজে উঠে পড়েছি তখন দৈত্যের মত গর্জন ক'রে উঠল আমাদের জাহাজ। বেলা তখন প্রায় দুটো। জাহাজের খালাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল, কেউ মোটা দড়ি, কেউ বা চেন টানাটানি করছে, সকলের মধ্যেই একটা ব্যস্ততার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। সুবেদার শৈলেন বোস, জমাদার অরুণকুমার মিত্র এবং আমি আমাদের কেবিনের সামনে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি —ডেকের উপর বাঙালী সৈনিকেরা ভিড় ক'রে একে অন্যের কাঁধে ভর ক'রে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়ে আছে জেটির দিকে তাকিয়ে। কারো মুখে কোন কথা নেই, জেটির উপরে আমাদের সৈনিক

বন্ধুরা করুণ নয়নে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কেন যেন আজ আপনা থেকেই মনটা অত্যন্ত ভারি হ'য়ে এসেছে। এ রকম যে হবে এমন ত কথা ছিল না,—কারণ "আমরা চলি সমুখ পানে, কে আমাদের বাঁধবে"—এই মনোভাব নিয়েই এ পর্য্যন্ত চলে এসেছি। কিন্তু তবু সমুখ পানে চলতে চলতে একবার পিছন পানে তাকাতে হ'ল। তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম বাঁধন কাটেনি। হৃদয়ে টান পড়ছে। বান্দ্রা জাহাজ যেন মায়ের কোল থে'কে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে চল্‌ল।

কাটল মাটির বাঁধন। যে মাটি আমাদের জননী—তাকে ছেড়ে চললাম, যাবার মুহূর্ত্তে তবু বিলীয়মান ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ তটভূমির উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম নিবেদন করলাম।

ধীরে ধীরে জাহাজ করাচীর দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। উপরে নীল আকাশ, নীচে নীল সমুদ্র—ধীরে ধীরে চোখ মুছে আত্মস্থ হলাম। তারপর আমরা সমস্বরে গাইতে লাগলাম—

"যে দিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননী ভারতবর্ষ"—

আঁখির অলস দৃষ্টি দূরে বহুদূরে কোথায় ভেসে চলেছে, তারই সম্মুখে প্রিয়জনের মুখ উঠছে ভেসে!

হঠাৎ খট্ ক'রে শব্দ হ'তেই চেয়ে দেখি অফিসের-আর্দালি সামনে দাঁড়িয়ে। সে বল্‌লে, মেজর স্যাণ্ডিফোর্ড উপরে আমাদের ডাকছেন। বোস সাহেব বললেন "জমাদার সাহেবরা—তা হ'লে উপরে যাওয়া!" এইটেই ছিল তাঁর কথা বলার বিশেষ ভঙ্গি।

তিনি কাউকে তুমি বা আপনি বলে ডাকতেন না। তিনজনে স্যাণ্ডিফোর্ড সাহেবের কেবিনে হাজির হওয়া গেল। জাহাজে থাক্‌বার সময় দিনে ও রাতে যে সকল কাজ আমাদের করতে হবে তারই একটা তালিকা প্রস্তুত করা হ'ল। তালিকাটি এই—

১। প্রত্যেক কম্পানি থেকে এক একটি প্ল্যাটুন পালা ক'রে কোয়ার্টার গার্ড (যেখানে বন্দুক, গুলির বাক্স, লিউইস গান্‌ প্রভৃতি থাকে সেই খানকার গার্ড) এবং জাহাজের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সেন্ট্রি নিযুক্ত করা।

২। সকালে এক ঘণ্টা দৈহিক ব্যায়াম এবং বিকেলে এক ঘণ্টা রাইফল্‌ এক্সারসাইজ করা হবে।

৩। দুপুরবেলা ইন্‌স্টট্রাকশন্‌ ক্লাস হবে।

৪। একজন ভারতীয় অফিসার রাত্রিতে জাহাজের সমস্ত জায়গা পরিদর্শন করবেন। রাত্রিতে যাঁর এই ডিউটি পড়ে তাঁকে 'অর্ডারলি অফিসার' বা 'ভিজিটিং রাউণ্ড' বলে। এঁর উপরে একজন ব্রিটিশ অফিসার থাকেন, তাঁকে 'গ্র্যাণ্ড রাউণ্ড' বলা হয়।

সেই রাত্রে আমি হ'লাম 'অর্ডারলি অফিসার'। জাহাজের প্রত্যেক কম্পানির জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্রিটিশ অফিসারদের জন্য দু'টি ফার্ষ্ট ক্লাস ও ভারতীয় অফিসারদের জন্য দুটি সেকেণ্ড ক্লাস। দপ্তর বা অফিস নির্দ্দিষ্ট হ'ল একটি ফার্ষ্ট ক্লাস কেবিনে। সুবেদার বোসের একটি কেবিন আর অরুণ ও আমি একসঙ্গে অপর একটি কেবিনে ছিলাম।

স্যাণ্ডিফোর্ড সাহেবের কেবিন থেকে বেরিয়ে আমার কম্পানির এন-সি-ওদের রাত্রির কাজকর্ম্ম বুঝিয়ে কেবিনে ফিরে এসে দেখি অরুণ বাঙ্কের উপর চিং হ'য়ে দুখানি হাত মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে। চোখ থেকে তার জল গড়িয়ে প'ড়ছে। ব্যাপার কি ? এক ঝাকানি দিয়ে তার চিন্তা সব ওলট পালট ক'রে ব'ল্লাম—হ্যাঁরে অরুণ, তুই যে বাঙালী তাকি সৈনিকের পোষাকেও ভুলবিনে ? একেবারে কেঁদেই আকুল ! অরুণ আমাকে বিশেষ আমল দিলে না, সে শুধু আমাকে ধমকে দিলে। জান্তাম সে কার ধ্যানে মত্ত ছিল, তাই তাকে আর জ্বালাতে প্রবৃত্তি হ'ল না। তবে একখানা কাগজে তার মানসীর নাম লিখে তার বুকের উপর রেখে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর বোস সাহেবের কেবিনে গিয়ে দেখি বুড়ো মোটা একটা ফাউণ্টেন পেন দিয়ে কি যেন লিখছেন।

আমাকে দেখে তিনি তাঁর সেই ভঙ্গিতে বল্লেন "জমাদার বাহাদুর সাহেব, এখানে এসে বসা।" সেখানে কিছু সময় আলাপ ক রে তাঁর কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ডেকের দিকে তাকিয়ে দেখি সৈনিকেরা কেউ গান করছে, কেউ এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ বা দল বেঁধে গল্পে মেতেছে, শান্ত্রীরা (সেন্ট্রি) নিজের নিজের জায়গায় তাদের কর্ত্তব্য করছে।

রাতের খাওয়ার ঘণ্টা বেজে উঠল। আমরা তিনজনে মুখ হাত ধুয়ে ডাইনিং রুমে উপস্থিত হলাম। রুটি, মাখন, মাংস, টিনে

রক্ষিত মাছ ও আলুসিদ্ধ ইত্যাদিতে গভীর মনঃসংযোগ করেছি এমন সময় অরুণ তার কাঁটা চামচে প্লেটের উপর রেখে দুহাতে মুখ চেপে ধরলে। বোস সাহেব খাওয়া থামাতে অনুরোধ করলেন।

আমি প্রথমতঃ ব্যাপারটি বুঝতেই পারিনি। অরুণকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে টিনের মাছ পেট থেকে টিনে ফিরে যাবার চেষ্টা করছে। কথাটি শোনা মাত্র আমারও ঠিক সেই রকম মনে হ'তে লাগল। মনে হ'ল মাছ যেন পেটের মধ্যে নাচ্ছে। জাহাজ তখন রীতিমত 'বোল' করছে—অরুণ এবং আমি আর টেবিলে ব'সে থাকতে পারলাম না, ছুটে বাইরে এসে যা কিছু আহার করেছিলাম তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করলাম। মাথা ঘুরছে। দেখলাম বুড়ো বেশ নির্ব্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছেন, মনে হ'ল যেন টেবিল সুদ্ধ তিনিও ঘুরছেন। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না, কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। অরুণও আমার অনুসরণ করলে। রাত ক্রমে বেড়ে চলেছে—আমাকে আবার রাউণ্ডে বেরুতে হবে একথা মনে করতেও ভয়ে শিউরে উঠছি। কিন্তু নিরুপায়। ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে আস্তে আস্তে উঠে ব'সে পূরোদস্তুর ইউনিফর্ম প'রে কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়লাম।—রাত তখন প্রায় বারোটা। এটা সেটা ধরে কোন রকমে টাল সামলে নীচে 'ডেকে' গিয়ে দেখি সে এক লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। সিপাহীরাও দুহাতে গলা চেপে সমুদ্রপীড়ার দাবী মেটাচ্ছে। সেন্ট্রিদের মধ্যে দু'একজন

ছাড়া সবাই তাদের কর্ত্তব্য করছে। জাহাজের সব জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে তিনতলায় মেজর স্যাণ্ডিফোর্ডের কাছে রিপোর্ট দিতে গিয়ে দেখি তাঁর কেবিনের দরজা বন্ধ। দরজায় 'নক্' করাতে তিনি দরজা খুলে দিলেন। আমি স্যালিউট ক'রে সমস্ত খবর বললাম। দেখলাম তিনিও সে সময় প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। সী-সিক্‌নেসের (সমুদ্র পীড়ার) ভয়ে তিনি বোতলের অর্দ্ধেক শেষ ক'রে বোতলটি পাশেই রেখে দিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে একটি গল্প মনে পড়ল। হুইস্কি সমুদ্র-পীড়ার ঔষধ এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে। নতুন সমুদ্র-যাত্রী এক ভদ্রলোক জাহাজে উঠেই সমুদ্র পীড়ার ভয়ে পূরো এক বোতল শেষ ক'রে বিছানায় শুয়ে পড়েন। পরদিন জেগে উঠে পাশের যাত্রীকে বললেন, দেখেছেন মশাই ওষুধের কি গুণ, সমুদ্র-পীড়া একটুও অনুভব করিনি। পাশের ভদ্রলোকটি বললেন, "হয়ত তা হবে ; কিন্তু চেয়ে দেখুন আমাদের জাহাজটা জেটিতেই বাঁধা আছে—কাল ছাড়েনি।"

যা হোক মেজর স্যাণ্ডিফার্ড আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দিলেন। পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দেশ মত আমরা জাহাজের উপর কর্ত্তব্য ক'রে যাচ্ছি।

এই ভাবে আরব্য সাগর, পারস্য উপসাগর পাড়ি দিয়ে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন জাহাজখানা 'আসার' নদীর মধ্যে নোঙর করলে সেই দিনই জাহাজ থেকে পল্টনের যাবতীয় জিনিস-পত্র ফ্লাটে বোঝাই করে "আসার" জেটিতে নামানো হ'ল।

জেটি থেকে প্রায় মাইল তিনেক মার্চ ক'রে মাকিনার একটি মাঠের মধ্যে এসে আমরা হল্ট (বিশ্রাম) করলাম। ষ্টাফ ক্যাপ্‌টেন উন্মুক্ত মাঠের খানিকটা জায়গা দেখিয়ে মেজর অ্যাড্‌লারকে বললেন, এইখানে বেঙ্গলী ব্যাট্যালিয়নএর ক্যাম্প পড়বে। তখন লাষ্ট পোষ্ট বেজে গেছে। রান্নাবান্নার কোন বালাই ছিল না, কারণ জাহাজ থেকেই হাতেগড়া রুটি ও আলুর দম আনা হয়েছিল, তাই খেয়েই সে রাত্রি কাটানো গেল। তারপর ঘুম। কে যেন আমাদের সবার চোখে ঘুমের যাদুদণ্ড স্পর্শ ক'রে গেল—যেমন রূপকথার দৈত্য ঘুম পাড়িয়েছিল রূপকথার রাজকন্যাকে রূপার যাদু-দণ্ড দিয়ে, তেমনি গাঢ় ঘুমে আমরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। সেই বেদুইনদের মাঠে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে যে যার মত পড়ে আছে। পল্টনের জিনিষ-পত্র এক এক জায়গায় স্তূপ করা রয়েছে, তারই মাঝে মাঝে চার পাঁচটি বন্দুক একসঙ্গে দাঁড় করানো (ইংরাজীতে 'পাইল' করা বলে)—আকাশে চাঁদ—প্রান্তরে সেই চাঁদের আলো নিস্তব্ধ শুভ্রতায় সৈনিকদের মনে অসীম শান্তি বিছিয়ে দিলে।

জেগে রইল শুধু সেন্ট্রিরা।

চতুর্থ পর্ব্ব

ঘুম ভাঙানি বিউগল্ বেজে উঠল—জেগে উঠে দেখি আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে। দূরে সাদা সাদা তাঁবু—সেখান থেকে বিউগল্-এর ধ্বনি ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে খেজুরগাছের বাগান দেখা যাচ্ছে। বাঙালী সৈনিকেরা কেউ উঠে পড়েছে, কেউ বা ব'সে আছে,—অর্থাৎ সবারই চোখে তখনও ঘুমের জড়তা।

এমন সময় "জমাদার সাহেব!" ডাকে চেয়ে দেখি সুবেদার বোস সাহেব তাঁর বিশাল বপু নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাছে আসতেই আমি সৈনিকের নিয়ম অনুযায়ী 'অ্যাটেন্‌শন' হ'য়ে স্যালিউট করলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কেমন মনে হচ্ছে?" আমি উত্তর দিলাম "মন্দ না সার, তবে জঠর প্রদেশে একটু যেন চাঞ্চল্য জেগেছে; প্রদেশটা যেন চন চন করছে। "তা একটু করবে" ব'লে বোস সাহেব অন্যদিকে চলে গেলেন।

১৯১৪ সালের যুদ্ধে তুর্কীরা জার্মানদেব পক্ষে যোগ দিয়েছিল। মেসোপটেমিয়া সেই সময় তুর্কীদের অধীন ছিল। মেসোপটেমিয়ায় সাধারণতঃ আরবী ও বেদুইনদের বাস। অক্টোবব মাসের মাঝামাঝি মেসোপটেমিয়া এক্সপিডীশনারি ফোর্স ভারতবর্ষ থেকে রওনা হয়। শাট এল-অ্যারাব পারস্য উপসাগবের ৬০ মাইল দূরে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস্ নদী যুক্ত হবার পর যে মিলিত ধারা প্রবাহিত হয়েছে, তারই

মেসোপটেমিয়ার ৪৯ সংখ্যক বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট ক্যাম্প এর একটী দৃশ্য ।

এইবার আমাদের কাজ আরম্ভ হ'ল। জায়গা মাপজোক ক'রে ব্যাট্যালিয়ন-এর ছোট বড় সমস্ত তাঁবু প্রায় দু'ঘণ্টার মধ্যে দাঁড় করানো হ'ল। ক্যাম্পের একটু দূরে ঘোড়ার আস্তাবল, শৌচাগার প্রভৃতিও তৈরী হ'ল। সে যেন আরব দেশের আরব্য উপন্যাস। সবই যেন যাদুবিদ্যার ফলে মুহূর্ত্তে গড়ছে আর ভাঙছে।

এর পর কোয়ার্টার গার্ড এবং ক্যাম্পের বিভিন্ন স্থানে সেন্ট্রি নিযুক্ত করা হ'ল। নতুন ক'রে সংসার পাতার হাঙ্গামা কম নয়। যা হোক, চা খাবার বিউগ্‌ল্ বেজে ওঠাতে মনে হ'ল যেন কাজ ঠিক ঠিক হচ্ছে। যে যার 'মগ্' নিয়ে ছুটল। এক মগ চা এবং একখানা মোটা হাতরুটি নিয়ে যে যার তাঁবুতে বসে খেতে আরম্ভ করলে।

আমি আমাদের তাঁবুতে এসে দেখি অরুণ মোটা একটা রুটির মধ্যে জেলি পূরে রাক্ষসের মত গিলছে। আর এক

বর্ত্তমান নাম (Shat-el-Arab) নদীর উপর অবস্থিত মহামারা, আবাদান প্রভৃতি স্থানে মুষ্টিমেয় ইংরেজ বাস করতেন। আবাদানে ইংরেজদের একটি তেলের কারবার আছে, (অ্যাংলোপারসিযান অয়েল কোম্পানী, সেই সময়ে ইংরেজদের মাত্র একটি জাহাজ ঐ জায়গায় থাকত)।

১৯১৪ নবেম্বর মাসে ইংরেজদের সঙ্গে তুর্কীদের প্রথম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজেরা তুর্কীদের পরাজিত করে, ফেও (Fao) নামক কেল্লা ও সহর দখল করে। তখন হ'তে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ ভীষণ হ'তে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করতে থাকে।

হাতে চায়ের মগ। এখানে এসেও আমরা দুজনে এক তাঁবুতে ছিলাম। সুবেদার বোস সাহেবের আলাদা তাঁবু ছিল।

ক্রমে বেলা চড়ে যাচ্ছে, সূর্য্য ক্রমশঃ অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাতাস এবং সেই বাতাসের সঙ্গে ধূলোবালি উড়ে সমস্ত ক্যাম্প যেন ছেয়ে ফেলছে। সারাদিন ক্যাম্পের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। অসহ্য গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বায়ুমণ্ডলের তাপ হবে প্রায় ১২২ ডিগ্রী। তার উপর জলাভাব! জল আনতে হচ্ছে বহুদূর থেকে খচ্চরের পিঠে করে। জল এনে সেই জল প্রত্যেক কম্পানিকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। সৈনিকেরা সব যার যার ওয়াটার বটল-এ জল রাখছে কেউ বা অন্যের বোতল থেকে জল চুরি করছে। জলের যেমন অভাব তাতে সেখানে কোন পুকুর থাকলে সেই পুকুরও চুরি হয়ে যেত।

গরমে এবং জলাভাবে সবাই অস্থির। মানুষ এবং পশু

যুদ্ধের দু'বছর পূর্ব্বে পারস্য উপসাগরের নিকট কয়েকটা তেলের খনি আবিষ্কৃত হয় এবং অ্যাংলো পারসিয়ান অয়েল কোম্পানী সেগুলোতে কাজ করতে থাকে। এতে ঐ অঞ্চলে ইংরেজের কর্ম্মক্ষেত্র এবং দায়িত্ব স্বভাবতই বেড়ে যায়। জার্মানিরও লক্ষ্য পড়ে এই জায়গার উপর, এ জন্যে কৌশল ক'রে জার্মানরা ভূ-মধ্য সাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত বাগদাদ রেলওয়ে নামে একটি রেলওয়ে তৈরী করবার মতলব করে। তুর্কী গভর্ণমেণ্ট জার্মানদের এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং ডয়েটশে বাঙ্ক বা জার্মান ব্যাঙ্কের অর্থ সাহায্যে একটি জার্মান কোম্পানী গঠিত হয় এবং এই কোম্পানী উক্ত রেলওয়ে তৈরী করবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকে

সবাই। তার উপর মাছির উপদ্রব! পল্টনের কাজ কিন্তু যন্ত্রের মত চলেছে—সেখানে শীতও নেই গ্রীষ্মও নেই।

এর পর খাবারের বাঁশী বাজল। একটু আগেই মনে হয়েছিল দেহের সব জল শুকিয়ে গেছে, কিন্তু খাবারের অবস্থা দেখে চোখে জল এল—জল বোধ হয় চোখের গ্যাণ্ডে তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল। মোটা মোটা হাতরুটি আর শুধু পেঁয়াজের তরকারী! তাও আবার এক পর্দ্দা ধূলোয় ঢাকা! কিন্তু পেটের আগুনের কাছে চোখের জল হার মানল। সেই রুটি রুমাল দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে শুধু তেল দিয়ে রান্না সেই তরকারী উদবসাৎ করা গেল।

সেদিনটা এইভাবে কেটে গেল। সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত রোদের তেজ খুব প্রখর থাকত—সন্ধ্যার দিকে তেজ কমে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আসত।

পরদিন থেকে সকাল বিকাল রীতিমত প্যারেড সুরু হল। অনাদি চ্যাটার্জি তার ট্যান্সপোর্ট সেকশন সহ আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। স্বাস্থ্য আমাদের বেশ ভালই আছে তবে মাঝে মাঝে দু একজনের সানষ্ট্রোক (সর্দ্দিগর্ম্মি) হয়েছিল।

তুরস্ক এবং জার্মানীর মধ্যে এই রেলওয়ে নিয়ে যখন আলোচনা চল্‌ছিল—ঠিক সেই সময় যুদ্ধ বাধে। জার্মানীর কৌশল ব্যর্থ হ'য়ে যায়।

মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে যে সব ব্রিটিশ জেনারেল, ব্রিটিশ এবং ভারতীয় রেজিমেণ্ট যোগ দিয়েছিল তাদের নামের সংক্ষিপ্ত তালিকা এইখানে দেওয়া গেল। এই তালিকার মধ্যে বাঙালী পল্টনের নাম ইতিহাসে উজ্জল হয়ে থাক্‌বে।

আমাদের ক্যাম্পের পাশে বার্মনস্, জাট্স্ প্রভৃতি রেজিমেণ্ট-এর ক্যাম্প পড়েছে। পথে যেতে যেতে দেখতে পেতাম ব্রিটিশ ও ভারতীয় রেজিমেণ্টের অনেক সৈন্য 'সানষ্ট্রোক' হয়ে রাস্তায় পড়ে যাচ্ছে। সেইজন্য রাস্তায় মাঝে মাঝে সান্ষ্ট্রোক ষ্টেশন ছিল। এই সব ষ্টেশনে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। দিনগুলো এইভাবে মন্দ কাটছিল না। কিন্তু—

…ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে। চোখ মেলে দেখি আমার কপালে আইস ব্যাগ। পাশে দাঁড়িয়ে একটি ইউরোপীয়ান নার্স। কথা বলতে যাচ্ছি, নার্স ইসারায় বারণ করলে। গলা থেকে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর টুকরো টুকরো বরফে ঢেকে দিয়েছে, বেশ আরাম অনুভব করছি। কিছুক্ষণ পরে একজন ডাক্তার এসে আমার নাড়ী টিপলেন। ডাক্তার চ'লে যাবার পর নার্স

ব্রিটিশ জেনারেল	**ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট**	**ইণ্ডিয়ান রেজিমেণ্ট**
ডিলামেন	ডেভন	রাজপুত
ব্যারেট	ডরসেট	মাবহাট্টা
ফ্রাই	নরফোক	পাঞ্জাবী
ইয়ংহাস্ব্যাণ্ড	রয়্যাল ওয়েল্শ্	গুর্খা
মেলিস	ফিউজিলিযাব	জাঠ
মার্শাল	সাউথ ল্যাঙ্কাশায়ার	ডগ্রা
নিক্সন	নর্থ ল্যাঙ্কাশাযার	শিখ
আইলমার	গ্লস্টার	ভোপাল
কেইলি	সাউথ ওয়েলস	

আমার শরীরের সমস্ত বরফ সরিয়ে নিলে—তারপর গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে আমার সমস্ত শরীর মুছে দিলে। তারপর একটি ফীডিং কাপ্-এ গরম দুধ আমাকে খেতে দিলে। শুনলাম আমি ক্যাম্পে জ্বর হয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলাম। রোগটা হচ্ছে স্যাণ্ডফ্লাই ফিবার। স্যাণ্ডফ্লাই নামক একজাতীয় মাছি বা মশার কামড়ে এই জ্বর হয়। জ্বর হঠাৎ বেড়ে যায়, অত্যন্ত মাথা ধরে এবং চোখের মধ্যে ব্যথা হয়। এই স্যাণ্ডফ্লাই খুব ছোট, সাধারণ মশারি এদের কোন বাধা দিতে পারে না। রোগ ভোগের মেয়াদ সাধারণতঃ তিনদিন। আমি যখন আক্রান্ত হই তখন আমাকে অ্যাম্বুল্যান্সের গাড়ীতে হাসপাতালে আনা হয়েছিল।

ব্রিটিশ জেনারেল	**ব্রিটীশ রেজিমেণ্ট**	**ইণ্ডিয়ান রেজিমেণ্ট**
গরিঞ্জ	বর্ডাবাস	গাঢ়োয়ালি
টাউনশেণ্ড	লিসটাব	হাজারা পাইওনিয়ার
পার্সি লেক	বাফ্‌স্	বেলুচি
মড	ব্ল্যাক ওয়াচ	ফর্টি নাইনথ্ বেঙ্গলীজ
ইত্যাদি	হার্টস্ ইওম্যানরি	(49th Bengalis)
	কিংস্ ওন্	বামনস্
	সীফোর্থস্.	ইত্যাদি।
	নর্থ ষ্টাফোর্ডস্	
	রয়্যাল ওয়ারউইকস্	
	হ্যাম্পশায়ার	
	ইত্যাদি	

কয়েক দিন পর মেজর ব্যারেটের দল এসে পৌঁছল। ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে মেজর ব্যাবেট সিনীয়র ব'লে বেঙ্গলী ব্যাট্যালিয়নের কম্যাণ্ডিং অফিসার হ'লেন।

বাঙালী সৈনিকদের শিক্ষাব ব্যবস্থা বসবাতেও বেশ ভাল ছিল। অন্যান্য রেজিমেণ্ট থেকে ভাল ভাল শিক্ষক আনা হ'ত তাদের শিক্ষাব জন্য। বসবাতে থাকবাব সময এক এক জন জেনারেল প্রায়ই আসতেন ব্যাটালিয়ন ইন্‌সপেক্ট কবতে। এবং সবাই প্রশংসা ক'বে যেতেন।

একদিন খবব এল, জেনাবেল মড বেঙ্গলী ব্যাটালিয়নকে বাগদাদ পাঠাতে হুকুম কবেছেন। জেনাবেল মড সে সময় মেসোপটেমিয়া এক্সপিডীশনারি ফোর্স-এব কম্যাণ্ডাব-ইন-চীফ। অর্থাৎ একবকম হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। তিনি থাকতেন বাগদাদে। এই খবর পেয়ে আমবা আনন্দে মেতে উঠলাম। কাবণ সেই

১৯১৭ সালেব আগষ্ট মাসে যখন বেঙ্গলী ব্যাটালিযন বসবাতে অবতীর্ণ হয তখন বাগদাদের খুব কাছে যুদ্ধ চল্‌ছিল. সে সময মেসোপটেমিযাব এক্সপিডীশনাবি ফোর্সেব কমাণ্ডাব ইন চীফ ছিলেন জেনাবেল সাব ষ্ট্যানলি মড্। তিনি ছিলেন বাগদাদে (বাগদাদ মেসোপটেমিযার বাজধানী) বসবা একটি বিখ্যাত বন্দব। ঐ সময বসবা উক্ত এক্সপিডীশনাবি ফোর্সেব প্রধান base বা কেন্দ্র ছিল। জাহাজে কবে সৈন্য, খাবাব এবং লড়াইযেব যাবতীয সাজসবঞ্জাম ভাবতবর্ষ ও অন্যান্য স্থান থেকে বসবা 'বেস'-এ জড় হ'ত। এইখান থেকে সৈন্য ও খাদ্য প্রভৃতি মেসোপটেমিযাব বিভিন্ন লড়াই ক্ষেত্রে পাঠান হ'ত।

সময় বাগদাদের খুব কাছেই পূরো লড়াই চলছিল। যাত্রার দিনের জন্যে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলাম, এক একটি দিন যেন এক একটি যুগ ব'লে মনে হতে লাগল।

বাগদাদে রওনা হবার পূর্ব্বে হাঁসপাতালে যারা ছিল তাদের আমি দেখতে গিয়েছিলাম। ২০।২৫ জন হাঁসপাতালে ছিল। কেউ সানষ্টোক কেউ বা জ্বরে ভূগছিল। ল্যান্স নায়েক নগেন ঘোষও ঐ দলে ছিল। সে বেচারা খচ্চরের লাথি খেয়ে বিছানায় পড়ে ছিল। তারা'ত আমাকে দেখে কেঁদেই অস্থির। তারা আমাকে বললে, আমি যেন কম্যাণ্ডিং অফিসাবকে বলে হাঁসপাতাল থেকে তাদের ছাড়িয়ে ব্যাটালিয়নের সঙ্গে বাগদাদ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি। কিন্তু হাঁসপাতালের কর্তৃপক্ষ তা ছাড়বে কেন? আমি তাদের অনেক বুঝিয়ে ফিরে এলাম।

বাগদাদ যাবার দিন স্থির হল। পরে অবিশ্যি নগেন ও আরও ৩।৪ জন হাঁসপাতাল থেকে ডিস্‌চার্জ্জ হয়ে ব্যাটালিয়নে যোগ দিয়েছিল। ব্যাটালিয়নকে দু ভাগে বিভক্ত ক'রে দুটো ষ্টীমারের দুদিকে দুটো 'বাজ´' বেঁধে মারগিল থেকে বাগদাদ অভিমুখে রওনা হলাম। অনাদি তার ট্র্যান্সপোর্ট সেকশন নিয়ে হেঁটে চলল। বাংলাদেশের মতই আঁকাবাঁকা নদী, তারই উপর দিয়ে আমাদের ষ্টীমার চলছে। নদীর দুধারে মাঝে মাঝে ছোট ছোট আরব দেশীয় পল্লীগ্রাম—সবই মাটির ঘর, চারদিকে খেজুর গাছের বাগান, মাঠে ঘাটে উট, ভেড়া, দুম্বা, চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট আরব ছেলেরা। 'গুফ্‌ফা' (ঐ দেশীয় একরকম

ছোট গোল নৌকা) চ'ড়ে স্ত্রী-পুরুষ নদী পারাপার করছে। মাঝে মাঝে নদীর পাড়ের সঙ্গে আমাদের বার্জে ধাক্কা লাগছে। ছোট ছোট আরব ছেলেমেয়েরা ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে—আর হাত বাড়িয়ে পয়সা বা রুটি চাইছে করুণস্বরে। কতকগুলো ছেলেমেয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কপালের উপব হাত দিয়ে সূর্য্যকে আড়াল ক'রে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

বহু দূরে বাতাসের সঙ্গে বালি কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আকাশের দিকে উড়ে চলেছে। কুরনা ও আমারা প্রভৃতি স্থান পার হ'য়ে একদিন সকাল বেলা আলি-এল-ঘারবির কাছে আমাদের জাহাজ থামল। সেন্ট্রিরা ছাড়া সবাই ষ্টীমার থেকে নদীর পাড়ে নামল। ব্রিটিশ অফিসাররাও নেমেছেন। অরুণ ও আমি নদীর পাড় থেকে একটু দূরে বেড়াতে গেলাম। সেখানে একটি মাঠের মাঝখানে গিয়ে দেখি ট্রেঞ্চের মধ্যে ও তার আশে পাশে অসংখ্য লাইভ শেল (জ্যান্ত গোলা), হ্যাণ্ড গ্রেনেড (বোমা), কার্ট্রিজ ইতস্তত পড়ে আছে। ছোট ছোট খালি টিন, পাগড়ি, টুপি, বুট, পট্টী, বেল্ট, জলের বোতল, হ্যাভার স্যাক (সৈন্যদের খাবার রাখবার ক্যানভাসের ব্যাগ) প্রভৃতি জিনিষ পত্র পড়ে আছে। ধূলো বালিতে এসবগুলি ঢেকে ফেলেছে। এই সব দেখে বেড়াচ্ছি এমন সময় হঠাৎ দুম্ ক'রে শব্দ হল, চেয়ে দেখি একটু দূরে একটি যুবক মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে মাটিতে শুয়ে আছে তারই খানিকটা দূরে একটা জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। আমরা দুজনে দৌড়ে তার কাছে যেতেই

সৈনিক বাঙালী
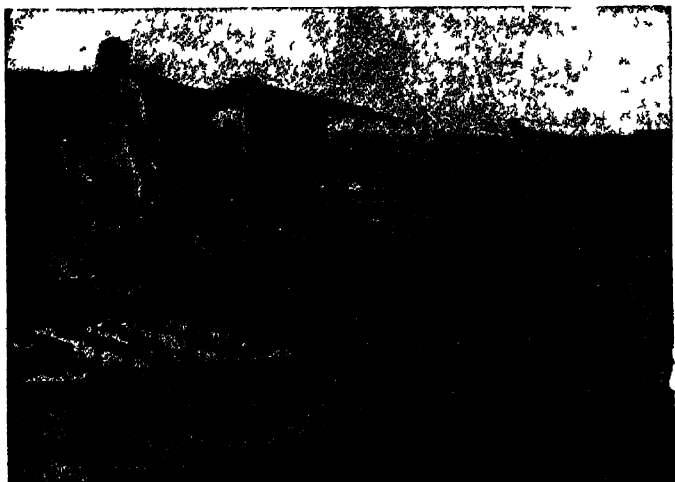
৪৯ সংখ্যক বেঙ্গলী বেজিমেণ্টেব লুইস্‌গান

সেক্‌সনেব একাংশ।

উপবিষ্ট বামদিক হইতে—জিতেন মিত্র, সুধীব বসু,

তেজস সোম। দণ্ডাযমান—শবৎ দত্ত।

সে উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাটেনশন হ'য়ে একটা স্যালিউট করলে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "কি হয়েছে ?" সে উত্তর দিল, "সার্, একটি হ্যাণ্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে দেখলাম।"

ছেলেটি আমাদেরই দলের একজন সৈনিক।

বিউগ্ল্ বেজে উঠল। আমরা সবাই ষ্টীমাবে উঠে পড়লাম।

এই ষ্টীমারেও দুবেলা দৈহিক ব্যায়াম এবং রাইফেল্ নিয়ে এক্সারসাইজ করতে হ'ত। দুপুর বেলা বস্তো ইন্স্ট্রাকশন ক্লাস। এক এক দিন বুট, বেল্ট, ব্যাণ্ডোলিয়ার, বোতাম, ইত্যাদি পরিষ্কার করবার ধূম পড়ে যেত। মাঝে মাঝে কিট্ইনস্পেকশন, অর্থাৎ প্রত্যেক সৈনিকের যাবতীয় জিনিষ পত্র ঠিক অবস্থায় আছে কিনা দেখা হতো। এইভাবে চল্ল আমাদের ষ্টীমারের জীবনযাত্রা।

রাত্রে ষ্টীমার এবং বার্জের চারদিকে কড়া পাহারা থাকত। একদিন দুপুরে একদল আরবী ছেলেমেয়ে আমাদের ষ্টীমাবেব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে এমন সময় আমাদের মধ্যে একজন একটি মেয়েকে বার্জের ভিতর হাত বাড়িয়ে তুলে নিলে। মেয়েটি দেখতে ভারী সুন্দর—সাহসীও বটে, কেন না এরকম ভাবে অপরিচিতের মধ্যে পড়েও একটু কাঁদলে না; পাড়ের ছেলেরা তাদের ভাষায় চীৎকার করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটিকে কিছু পয়সা ও রুটি দিয়ে পাড়ে নামিয়ে দেওয়া হ'ল।

এইবার আমরা কুট-এল-আমারা ছাড়িয়ে চলেছি। এইখানেই বাংলাদেশের আর্ত্ত সেবকেরা (বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোর) কাজ ক'রে এত নাম করেছিল এবং জেনারেল টাউন-

রাইফেল ইনস্‌পেক্‌শন্‌ বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের সৈন্যদলের একাংশ।

শেগুের সঙ্গে তুর্কীদের হাতে বন্দী হয়েছিল। ষ্টীমারে এতদিন চলেছি কিন্তু তবু কখনও মনে হয় নি যে ষ্টীমার-জীবন ভাল লাগছে না। ভাল লাগছে না ত নয়ই বরঞ্চ নূতন নূতন দৃশ্যে এবং ভেসে চলার নিরবচ্ছিন্ন গতিতে ষ্টীমার-জীবন অত্যন্ত আরামপ্রদ ব'লেই মনে হয়েছিল। তা ছাড়া একা অপরিচিত লোকের মধ্যে পড়লে মন খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু এখানে যে আমরা এক বৃহৎ পরিবার। এমন নিবিড় এবং ঘনিষ্ট বন্ধুই বা পৃথিবীতে কোথায়? এখানে একজন বিপদে পডলে আর পাঁচজন পালায় না, একজনের মৃত্যু হ'লে আর পাঁচজন মৃত্যুর সামনে বুকপেতে দাঁড়ায়। কাজেই জলে স্থলে মাঠে ঘাটে যেখানে আমরা সবাই আছি, সেইখানেই আমাদের গৃহ।

একদিন দূর থেকে হেলিওগ্রাফের সিগন্যাল পাওয়া গেল। হেলিওগ্রাফ হচ্ছে সূর্য্যের আলোর প্রতিফলন দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন। ফীল্ড গ্ল্যাস দিয়ে আশেপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু মাঝে মাঝে আলোটা চোখে লাগছে। আলোর সঙ্কেতে প্রশ্ন হ'ল "হু আর ইউ"—অর্থাৎ তোমরা কে? আমাদের হেলিওগ্রাফ তার উত্তর দিলে, "বেঙ্গলীজ," তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "তোমরা কে?" তারাও তাদের পরিচয় দিলে। অর্থাৎ তারা আমাদের মিত্র। যেখান থেকে সিগন্যাল বা সঙ্কেত পেয়েছিলাম, ক্রমে সেইস্থানের কাছে এসে পড়লাম। যখন সে জায়গাটা পার হয়ে চলেছি তখন দেখি সারি সারি তাঁবু সাজানো রয়েছে। নদীর পাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যেরা দাঁড়িয়ে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে।

কেউ রুমাল ওড়াচ্ছে, কেউ শিস্ দিচ্ছে, কেউ হাত তুলে ডাকছে, কেউ টুপি আন্দোলিত করছে। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে আজিজী।

টেসিফনও ছাড়িয়ে যাচ্ছি। প্রায় ১৭০০ বছর পূর্ব্বে তৈরী রোমানদের স্মৃতিচিহ্ন এখনও মরুভূমির বুকের উপর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইখানে আমাদের ষ্টীমারের গতি একটু মন্থর করা হ'ল যাতে আমরা স্থানটি ভাল করে দেখ্তে পারি। এইভাবে আমরা বাগদাদ অভিমুখে চলেছি। এইবার আমাদের গন্তব্য স্থানে এসে পড়েছি। নদীর দুধারে মাঝে মাঝে তাঁবু খাটানো রয়েছে, কাছে কাছে খেজুরগাছের বাগান। বাগদাদ শহরের দৃশ্য বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—অসংখ্য ঘর বাড়ি, তারই মধ্যে মসজিদের চূড়া মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় বাড়ির উপর ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা উড়ছে। নদীর মধ্যে ছোট বড় লঞ্চ চলাফেরা করছে। কয়েকখানা ব্রিটিশ 'গান বোট' নোঙর করা অবস্থায় আছে। একটি পণ্টুন ব্রিজের উপর দিয়ে লোক যাতায়াত করছে।

পাঁচশত মাইল অতিক্রম ক'রে, বিভিন্ন বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র পার হয়ে প্রায় পনের দিন ধ'রে টাইগ্রিস নদীর উপর দিয়ে এসে বিকেলের দিকে—১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সেই হারুণ-আল-রসিদের বাগদাদ শহরের সিটাডেল গেট-এর কাছে বেঙ্গলী ব্যাটালিয়ন এসে পৌঁছল।

মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে (১১ই মার্চ ১৯১৭) বাগদাদ

ইংরেজের অধিকারভুক্ত হয়েছে। পারস্য উপসাগর থেকে যে যুদ্ধের বহ্নি টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্ত্তী পল্লী, নগর এবং সহস্র সহস্র লোক ধ্বংস করেছিল এখন সেই বহ্নি বাগদাদের অতি নিকটে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। বাগদাদ এখন সেকেণ্ড লাইন অব কমিউনিকেশন—অর্থাৎ ফায়ারিং লাইনের ঠিক পিছনে।

এইখানে সিটাডেল গেট থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে একটি খেজুর গাছের বাগানের মধ্যে বেঙ্গলী ব্যাটালিয়নের ক্যাম্প পড়ল। অতঃপর জেনারেল মডকে দেখবার জন্য বাঙালী সৈনিকরা উৎসুক হয়ে উঠল, কারণ তিনিই এই তরুণ বাঙালী সৈনিকদের নিজের কাছে কয়েক মাস রেখে ফায়ারিং লাইনে পাঠাবেন বলে, বসরা থেকে সোজা বাগদাদে এনেছেন। কয়েক দিন পরেই তিনি এলেন বেঙ্গলী ব্যাটালিয়ন ইন্‌স্‌পেকশন করতে। তিনি ভারতীয় অফিসার থেকে সৈনিক পর্য্যন্ত সবারই কাছে এসে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সৈনিক হয়ে আসবার আগে কি করা হ'ত, কতদূর পড়াশুনো করা হয়েছে, সৈনিক জীবন কেমন লাগছে, ফায়ারিং লাইন-এ যেতে প্রস্তুত কিনা—এই জাতীয় সব প্রশ্ন। বাঙালী ব্যাটালিয়ন পরীক্ষা ক'রে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং এদের সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণা হয়েছিল। সেনাদের তিনি এই বলে আশ্বাস দিলেন যে তাদের আগামী শীতকালের মধ্যেই ফায়ারিং লাইনে পাঠান হবে। আমাদের কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল ব্যারেট আমাদের ব্যাটালিয়নকে সেইভাবে প্রস্তুত করে তুলতে লাগলেন।

এইখানে এসে সুবেদাব শৈলেন বোস সুবেদাব মেজবেব পদে এবং কয়েকজন জমাদাব সুবেদাবেব পদে উন্নীত হলেন।

বাঙালী সৈনিকবা মন-প্রাণ দিযে খাটতে লাগল। বাগদাদে এসে ব্যাটালিযনেব নাম হল ফর্টিনাইনথ বেঙ্গলীজ। (49th Bengalis). বাঙালী সৈনিকেব পক্ষে এ সম্মানের মূল্য অনেক। তা ছাড়া, কোন কোব কম্যাণ্ডাবকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে একটি পৃথক ইউনিটকে এইভাবে ইনসপেক্ট কবে সম্মানিত কবতে দেখা যায না। এটাও বাঙালী সৈনিকদেব পক্ষে কম গৌববেব বিযয নয।

এই ফর্টিনাইন্‌থ বেঙ্গলীজ-এব উপব এখন পডল গুরুদাযিত্বপূর্ণ ভাব। তাবা বাগদাদ বক্ষণাবেক্ষণেব আংশিক ভাব গ্রহণ কবলে। দিনগুলি কি উত্তেজনাব মধ্যেই না কাটছে! মাঝে মাঝে শত্রু-পক্ষীয এয়ারোপ্লেন আকাশেব বহু উচ্চ থেকে এক একবাব হানা দিযে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ 'অ্যান্টি এয়াব ক্রাফ্‌ট্‌ গান্‌' তাব পাল্টা জবাব দিচ্ছে—তাদেব লক্ষ্য কবে। দিনবাত সবাই সন্ত্রস্ত এবং যে কোন কাজেব জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। সে কি উত্তেজক এবং বোমহর্ষক ব্যাপাব!

এল শাবদীয় পূজা-উৎসবেব দিন। কামানেব সঙ্গে বেজে উঠল ঢাকেব বাজনা। পূজাব এই ত কাল! বাঙালী সৈনিকেবা নিজ হাতে প্রতিমা গডল, পুরোহিত হ'ল আব এক সৈনিক। দেবীব কাছে সেদিন বাঙালী সৈনিকেবা কি প্রার্থনা করেছিল? —কবেছিল বিজয় প্রার্থনা—তাতে যদি মৃত্যু হয় তবু যেন তা

গৌরবপূর্ণ হয়। বীরের মত মৃত্যু—কাপুরুষের মত নয়—সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু - পিছন ফিরে নয়।

এই সময় বসরা থেকে জমাদার অনাদি চ্যাটার্জি এবং হাবিলদার অমল গাঙ্গুলি তাদের ট্রান্সপোর্ট সেকশন নিয়ে ৫ শত মাইল পদব্রজে বেদুইন দস্যুদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে—মরুভূমির দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হ'ল। অনাদি যখন সদলবলে আমাদের ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হ'ল তখন তাদের দেখে মনে পড়ল রিপভ্যান উইঙ্কল-এর চেহারার কথা। ইয়া দাড়ি গোফ— আঙ্গুলের নখ বেড়ে গেছে গায়ের রং হয়েছে তাম্রবর্ণ, মাথার চুল টুপির ভিতর থেকে বাইরে এসে কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলছে, তার উপর ধূলোবালিতে সমস্ত শরীর ঢাকা। এরকম চেহারা আমাদের দেশের ছোট ছেলেরা দেখলে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠত, আমরাই ভয় পেয়েছিলাম। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা গেল এই যে স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এদের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কম্যাণ্ডিং অফিসার ইনস্‌পেক্‌শনে এসে এদের মূর্ত্তি দেখে প্রায় অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করলেন! এই রকম অপরিষ্কার চেহারা দেখে বেশ ধমকে দিলেন। আমরা কিন্তু এই তিরস্কারে একটু দুঃখিত হয়েছিলাম, কারণ বেচারীরা পাঁচশ' মাইল হেঁটে এসেও একটু উৎসাহ পেল না! অনাদি কিন্তু এতে দুঃখিত হ'লনা; বরঞ্চ গলা ছেড়ে গান ধরে দিল—

"Round round round
the blooming moon."

এই গানটি ছিল তার বিশেষ প্রিয়। যাই হোক্ এখানে দিন-গুলো মোটের উপর বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল। কেবল একটি মাত্র উদ্বেগ আমাদের মনে, কখন শীতকাল আসবে! কারণ সেই সময় আমরা ফায়ারিং লাইনে যাবার সৌভাগ্য লাভ করব। শীতের মধ্যে আগুন নিয়ে খেলার প্রবৃত্তিটাই হয়ত স্বাভাবিক। সেজন্যে যুদ্ধ শিক্ষাও দ্রুত চলেছে।

আমাদের আনন্দের মধ্যে অকস্মাৎ একদিন বিপদের ছায়া-পাত হল। সংবাদ এল কম্যাণ্ডর-ইন-চীফ জেনারেল সার্ স্ট্যান্লি মড হঠাৎ কলেরায় মারা গেছেন। (মৃত্যু তারিখ ১৮ই নভেম্বর ১৯১৭)। তাঁর মত ব্যক্তিত্ব, তাঁর মত চরিত্র এবং তাঁর মত শক্তি, কম জেনারেলেরই দেখা যায়। আফগানিস্থান থেকে আরব পর্য্যন্ত ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব। তাঁকে হারিয়ে আমরা যেন আমাদের প্রধান অভিভাবককে হারালাম। হঠাৎ যেন আমাদের নির্ভর এবং আশ্রয় সরে গেল। তাঁর কুটবিজয়, বাগদাদের মত শহর অধিকারের গৌরব, তুর্কীশক্তিকে বার বার ধ্বংস ক'রে দেওয়া—তিনি ভিন্ন আর কারো দ্বারা সম্ভব হ'ত বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। তাঁর অধীনে যে সব এঞ্জিনিয়ারিং কাজ হয়েছিল তাতেও তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তিনি বাঙালী সেনাদের সত্যই খুব ভালবেসেছিলেন। বাঙালী সেনারাও তাঁকে গভীরভাবে ভাল-বেসেছিল। তাঁর মধুর স্মৃতি আমাদের আমরণ মনে থাকবে। তিনি বেঁচে থাকলে বাঙালী সৈনিকের ইতিহাস আজ অন্য রকম

হ'ত। যে দেশে তাঁর মত লোক জন্মগ্রহণ করে সে দেশ ধন্য।

মৃত্যুকালেও তিনি বাঙালী সেনাদের কথা ভোলেননি—অন্তিম সময়ে তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল বাঙালী সৈনিকেরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়াক। তারা তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করেছিল। এই বীরকে মরুভূমির বুকে সমাহিত করা হ'ল। লাষ্ট পোষ্ট বেজে উঠল শ্রান্ত বীরকে শান্তির কোলে বিশ্রাম করতে দেওয়া হ'ল।

ক্রমে শীতকাল আসন্ন হল। দিনের পর দিন যুদ্ধও ভীষণ রূপ ধারণ করতে লাগল। আমাদের সামনে সৈনিকেরা চলেছে যুদ্ধক্ষেত্রে—তাদের ফিরে আসতে দেখছি আহত অবস্থায়। এক এক দিন দেখতাম ফায়ারিং লাইন থেকে ফোর্ডভ্যানে ক'রে বহু আহত সৈনিককে আমাদের ক্যাম্পের পাশে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান জেনার‍্যাল হস্পিট্যালে আনা হচ্ছে।

যে দেশে যুদ্ধ হয় সেখানকার সৈনিকদের কি ভাবে দিন কাটে তা ঘরে ব'সে কল্পনা করা যায় না। বাইরে থেকে সবাই জানে সৈনিকেরা লড়াইয়ে এসেছে—গুলি খাচ্ছে, আহত হচ্ছে এবং মরছে, বাস্। কিন্তু এ ছাড়াও যে আনুষঙ্গিক অনেক কিছু ব্যাপার আছে সেটা ধারণা করা যায় না। পরাজিত সৈন্য যখন পিছু হটতে থাকে তখন তারা যে সব জায়গা দিয়ে চলে—শহর বা গ্রাম—তখন সেই সব শহর বা গ্রামবাসীর উপর তারা অধিকাংশ সময় অত্যাচার করে। তাদের যা কিছু সব লুণ্ঠন ক'রে তাদের একেবারে নিঃসম্বল ক'রে রেখে যায়। তুর্কী
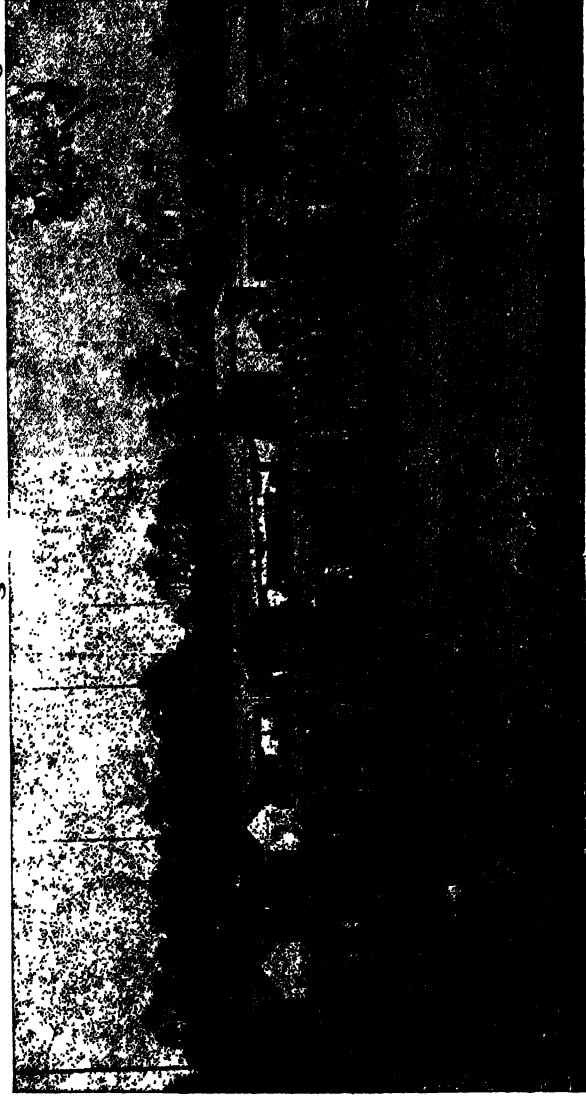
মেসোপটেমিয়ায় ৪৯ সংখ্যক বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের সৈন্যদলের একাংশ। পশ্চাতে লুইস্‌গান, সিগ্‌ন্যালার ও বিউগ্‌লার সেক্‌শন্‌স্‌।

সৈন্যেরাও তাই করেছিল। বিজেতার ঘাড়ে পড়ে সেই সব শহরবাসী বা গ্রামবাসীকে বাঁচাবার ভার। লক্ষ লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে এই রকম লক্ষ লক্ষ নিঃসম্বল লোকের এবং নিরাশ্রয় পশুর খাদ্য যোগাচ্ছে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট। এ দায়িত্ব বড় ভীষণ। এই সময়—এমনি দিনে আমরা সেখানে উপস্থিত। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। নাগরিকদের মধ্যে তখন ধনী নির্ধন ভেদ ঘুচে গেছে তারা সব এখন এক। ভারতবর্ষ থেকে খাদ্য এনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এদের বাঁচিয়ে রাখছে।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে ক্রমে শীত এবং যুদ্ধ—দুইই ভীষণ হতে ভীষণতর রূপ ধারণ করছে। আজ প্রায় পনের দিন আমরা 'ডগ্ বিস্কিট' (অর্থাৎ কুকুরের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত বিস্কুট) দুধ-চিনিহীন চা "শুকনো সবজী" (ড্রাই ভেজিটেব্ল অর্থাৎ শাকসবজী, নানারকম ডাল, মসলা ও নুন একত্র ক'রে শুকিয়ে রাখা হয়—পরে খাবার সময় গরম জলে ফুটিয়ে নিলে এক রকম খাদ্য প্রস্তুত হয়) এই সব খেয়ে দিন কাটাচ্ছি। কারণ তখন কিছুদিনের জন্য খাদ্যের আমদানি বন্ধ ছিল। কিন্তু তবু এতে আমাদের দুঃখ বিশেষ ছিল না—সবাই মিলে এসব অম্লান বদনেই সহ্য করে যাচ্ছি—ঠিক সৈনিকের ধৈর্য্য এবং সংযম নিয়েই।

ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যেও কোন প্রকার জাতিভেদ ছিল না। নিজ নিজ সব কিছু সংস্কার ভুলে গিয়ে হৃদয়ের দিক

দিয়ে পরস্পর পরস্পরের অতি কাছে এসে পড়েছিল। আমি লক্ষ্য করেছি—ব্রিটিশ সৈনিকেরা খুব আমোদপ্রিয় এবং মিশুক। অবসর সময় হাসি-ঠাট্টা—শিস্ বা গান মুখে লেগেই আছে। দেখেছি মরণের মুখে এসেও এরা প্রণয়ের কথা ভুলতে পারে না। একটু অবসর পেলেই প্রেমের গান গায়, প্রণয়িণীর বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করে। তার ফোটো বা চিঠি বা অন্য কোন অভিজ্ঞান যত্ন করে বুক পকেটে রেখে দেয়। সৈনিকদের একটি বিশেষ আনন্দের দিন আসে যেদিন ক্যাম্পে বা ফায়ারিং লাইনে ট্রেঞ্চের ভিতর চিঠির ব্যাগ এসে উপস্থিত হয়।

জেনারেল মডের মৃত্যু সংবাদ যথাসময়ে শত্রুশিবিরেও গিয়ে পৌঁছল এবং এই সময় থেকে তারা রামাডি, সাম্মারা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানের ফায়ারিং লাইনের ট্রেঞ্চগুলির শক্তি বৃদ্ধি ক'রে টার্কিশ পোজিসন (Position) সুদৃঢ় করতে লাগল। এদিকে শীতও পড়েছে ভীষণ। তারপর আবার ঠিক শীতের সময়েই এদেশে 'মনসুন' আরম্ভ হয়। ভীষণ কনকনে শীত। মাথার উপর অবিরাম বর্ষণ—সমস্ত পথ ঘাট মাঠ কর্দ্দমাক্ত। মোজা, বুট, পট্টি, গরম গেঞ্জি, গরম শার্ট, গরম কোট—তার উপব গরম মোটা ওভারকোট, মাঙ্কিক্যাপ, হ্যাট, হাতে দস্তানা—কিন্তু তবু শীত যায় না। শীত সমস্ত বাধা ভেদ ক'রে হাড় কাঁপিয়ে তোলে। দুটো চোখ ও নাক কোনরকমে বের ক'রে বাঙালী সৈনিকেরা তাদের কর্ত্তব্য নিয়মিত ক'রে যাচ্ছে।

সেন্ট্রি-ডিউটির সময়—দুঘণ্টা থেকে একঘণ্টা, একঘণ্টা থেকে

আধঘণ্টা, আধঘণ্টা থেকে পনের মিনিট করা হয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও সেন্ট্রিরা নিজেদের পোষ্টে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যাচ্ছে। তাঁবুর ভিতর কাঠ জ্বেলে আগুন করা হয়েছে—সেন্ট্রিরা পালা ক'রে নিজেদের গরম রাখবার জন্য চেষ্টা করছে—তাঁবুর ভিতরে এসে। মরুভূমিতে জল দেখলে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যেমন উল্লসিত হ'য়ে ওঠে—শীত-মরুভূমিতে তেমনি আগুনের আভাস মাত্র দেখেই শীতার্ত্ত সৈনিক উল্লসিত হয়ে উঠছে।

এত দুর্দ্দশার মধ্যে আরও দুর্দ্দশা আছে। অর্থাৎ পিশু নামক ক্ষুদে পোকার কামড়! চোখে দেখা যায় না—গরম কাপড় ও কম্বলের ভিতর লুকিয়ে থাকে। এইভাবে দৃশ্য এবং অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে চলেছে আমাদের লড়াই। জামা কাপড় খোলবার উপায় নেই—পশুদের গায়েও কম্বল জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এক প্যাকেট সিগারেট দশ আনা ক'রে কিনে খাওয়া হচ্ছে—সেও আবার একটি সিগারেট দু'তিনজনে পালা ক'রে টানা—গঞ্জিকাসেবীদের মত। মনে পড়ে একটি সেফটি ক্ষুর পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম।

এইখানে জমাদার ফণী দত্ত সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ফণী দত্ত ফর্টি নাইন্থ্ বেঙ্গলীজ্-এর কোয়ার্টার মাষ্টার জমাদার। ফণী এর পূর্ব্বে বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোর্-এর সঙ্গে কুটে বন্দী হয়েছিল। এই ফণীর উপর ভার ছিল—বাঙালী সৈনিকদের এবং ঘোড়া ও খচ্চরের খাবার সমস্ত ব্যবস্থা করার। ভোর থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত তাকে অবিশ্রান্ত

খাট্‌তে হ'ত। ষ্টোর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসা—রান্নার ব্যবস্থা সবই করতে হ'ত। অবশ্য ফণীর উপরে আর একজন ব্রিটিশ অফিসার ছিলেন। আর কয়েকজন এন-সি-ও থাকত ফণীকে সাহায্য করবার জন্য। ফণী মেসোপটেমিয়া ও কুর্দ্দীস্থানে বাঙালী সৈনিকদের জন্য যেভাবে খেটেছে তার তুলনা হয় না। এরকম ধৈর্য্যশীল কর্ম্মঠ ব্যক্তি সাধারণতঃ দেখা যায় না। নিজের সমস্ত মনপ্রাণ এবং দেহ দিয়ে সে খেটেছে।.. তার কাছে এ বিষয়ে যে আমরা কত ঋণী তা প্রকাশ করতে পারব না। অনেক সময় খেতে দেরী হ'লে অথবা খাবার খারাপ হলে তাকে আমরা সকলেই গাল দিতাম কিন্তু এসব অন্যায় অত্যাচার সে হাসিমুখে সহ্য করেছে। আমরা যে তার উপর এরকম করেছি তা ভাবলেও এখন লজ্জা বোধ হয়।

আজ আকাশ একটু পরিষ্কার সকালের দিকে—আমাকে পিকেট ডিউটিতে যেতে হবে। আমার একটি প্ল্যাটুন তৈরী হচ্ছে—তাঁবুর ভিতর বসে মগে চা খাচ্ছি, এমন সময়—এয়ারো-প্লেনের শব্দ! বেরিয়ে দেখি ক্যাম্পের উপর তুর্কী এয়ারোপ্লেন। সঙ্গে সঙ্গে রাইফল্‌-এর শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। সবাই ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে প'ড়ে কেউ নালার মধ্যে কেউ বা মাঠে কেউ বা ছোট ছোট মাটির ঢিপির পাশে কাদার মধ্যে শুয়ে পড়লাম। চেয়ে দেখি অনিল মিত্র উত্তেজিত অবস্থায় বন্দুক হাতে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এয়ারোপ্লেনটি অকস্মাৎ এত অল্প সময়ের মধ্যে এত নীচ দিয়ে উড়ে চলে গেল

যে অ্যান্টিএয়ারক্রাফ্‌ট্‌ গান্‌ ছোড়বার সময়ই দিলে না। এয়ারো-প্লেনটি সেদিন বাগদাদ রেলওয়ে ষ্টেশনে একটি বোমা ফেলে কিছু ক্ষতি করেছিল। এয়ারোপ্লেন থেকে সাধারণতঃ রাস্তা, নদী, পুকুর, তাঁবু প্রভৃতি স্পষ্ট দেখা যায়। সেই জন্যে যখনই শত্রুপক্ষের বিমান দেখা যেতো তখনই ক্যাম্প ও রাস্তা ছেড়ে মাঠ, নালা প্রভৃতি স্থানে শুয়ে পড়তে হ'ত।

কিছুক্ষণ পরে আমার প্ল্যাটুন নিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বিভিন্ন স্থানে এক একটি কেন্দ্র করে বাগদাদ শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক সময় যারা এই শহরের ধনী-মানী ব'লে সবার সম্মান পেতো, আজ তারাই একমুঠো অন্নের জন্য পথে এসে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে! ধনী আজ দরিদ্রের সঙ্গে এক হ'য়ে স্ত্রী পুত্র নিয়ে ভিখারী হয়েছে। করুণ সে দৃশ্য!—তুর্কী সৈন্যেরা শহরবাসীকে এই রকম দুর্দ্দশাগ্রস্ত ক'রেছিল।

ডিউটি শেষ ক রে প্রায় বারোটার সময় ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

রবিবার। আজ আমার কোন কাজ নেই। বসে বসে ভাল লাগছিল না,—মনে হল একটু শহরের মধ্যেটা ঘুরে আসি।

শহরের এক জায়গায় এসে রাস্তার উপর একটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী দেখতে পেলাম। সেই বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি বৃদ্ধ আর একটি দশ বারো বছরের মেয়ে। মনে হ'ল কোথায় যেন এদের দেখেছি। খানিকক্ষণ চেয়ে মনে পড়ল পিকেট ডিউটির দিন এরা খাবার আনতে গিয়েছিল। বৃদ্ধটিও

আমাকে চিনতে পেরে হাতের ইসারায় আমাকে ডাকলে। বৃদ্ধের বৈঠকখানায় কয়েকখানা চেয়ার, সোফা, একটি টেবিল, দেওয়ালে কয়েকটা ছবি টাঙানো রয়েছে—মেঝেতে কার্পেট। ঘরখানি বেশ পরিপাটি ক'রে সাজানো। এরা জাতিতে ইহুদী। পূর্ব্বে অবস্থা খুবই ভাল ছিল। পরিবারের লোক সংখ্যা চার জন—বৃদ্ধ, তাঁর স্ত্রী, একটি ছেলে ও মেয়ে। ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়ত। এরা সবাই ফরাসী ভাষায় কথা বলে। বৃদ্ধ ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে। তুর্কী সৈন্যরা যখন বাগদাদ ছেড়ে চলে যায় তখন এদের যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী এবং অর্থ লুট ক'রে নিয়ে যায়। বৃদ্ধের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হ'ল। অবশেষে আমাকে একটুকরো 'খবুস' (ঐ দেশীয় রুটি) ও এক কাপ কফি খেতে দিলে। আমি খেতে ইতস্ততঃ করছিলাম—তা দেখে বৃদ্ধ বললে "কোনো ভয় নেই।" মেয়েটি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল, এইবার সেও ব'লে উঠল "তুর্কি মু-জেন—ব্রিতিশ জেন—অর্থাৎ তুর্কীরা খুব খারাপ—ব্রিটিশরা খুব ভাল।

ক্রমে নূতন বৎসর এসে পড়ল। এই চাঞ্চল্যেও সৈনিকরা চিরপ্রচলিত অনুষ্ঠানের ত্রুটি করলে না। নব-বৎসরকে সাদরে আহ্বান করা হ'ল। এদিকে তুর্কী সৈন্যেরা কিন্তু যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। কারণ জেনারেল মডের মৃত্যু হলেও তাঁরই প্ল্যান অনুযায়ী যুদ্ধ চলছিল।

এই সময় হঠাৎ মারাত্মক এক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হ'ল। ব্যাধিটির নাম 'সেরিব্রো-স্পাইন্যাল-ফিবার'।—সাঙ্ঘাতিকরূপে

সংক্রামক। এ ব্যাধি সেখানকার সৈন্যদের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে দিতে লাগল। ডাক্তার (মেডিক্যাল অ্যাডভাইসর) বললেন বাঙালী সৈন্যদের স্থানান্তরিত করতে। আজিজি স্থানটি শুকনো ব'লে ফর্টিনাইন্‌থ্‌ বেঙ্গলীজকে সেইখানে পাঠানো স্থির হ'ল। জানুয়ারির শেষভাগে তারা সেখানে গিয়ে হ্যাম্পশায়ার রেজিমেণ্টের স্থান দখল করলে।

বাগদাদ ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না, কিন্তু এই মারাত্মক জ্বরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হ'লে এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

তখনও শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণ চলছে। বিমান ক্রমাগত এসে বাগদাদে হানা দিচ্ছে—তাদের প্রধান লক্ষ্য গোলাবারুদের ঘর। একদিন সমস্তদিন বৃষ্টির পর রাত্রে বৃষ্টি থেমে গেল। সেন্ট্রি ছাড়া সবাই তাঁবুতে ঘুমিয়ে। হঠাৎ মাঝ-রাতে ভীষণ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল—সবাই বেরিয়ে এলাম তাঁবুর বাইরে। অনাদি চীৎকার করছে—তার তাঁবুর খানিকটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ব্যাপার কি? কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করা গেল। যাকে আমরা অনেকে ঠাট্টা ক'রে বলতাম 'বৌমা'—তিনিই শত্রুপক্ষের বিমান থেকে মাটিতে পড়েছেন। ভাগ্যিস্‌ মাটি তখন মাটি ছিল না, কাদা হ'য়ে গিয়েছিল, তাই বোমাটি ভাল ক'রে ফাটতে পারেনি—নইলে লক্ষ্যও ছিল ঠিক—পড়েছিলও ঠিক—কিন্তু মাটির বদলে কাদার স্পর্শ পেয়ে শত্রুপক্ষের লক্ষ্যটাই মাটি হ'য়ে গেল। কাদা না থাকলে সেদিন হয়ত উড়ে যেতাম, আর হয়ত এই ডায়েরিও লেখা হ'ত না।

পঞ্চম পর্ব্ব

আজিজিতে, টাইগ্রিস নদীর নিকটে, একটি প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠে আমাদের ক্যাম্প প'ড়েছে। পাশেই রেলওয়ে ষ্টেশন। বাগদাদ থেকে আজিজি প্রায় পঞ্চাশ মাইল হবে। স্থানটি মরুভূমির কাছে—সুতরাং এখানকার জমিতে বালির অংশ বেশি, কাজেই স্থানটি শুক্‌নো। আজিজি যুদ্ধের পক্ষে একটি মূল্যবান কেন্দ্র ব'লে—এখানকার আউটপোষ্টও মূল্যবান—কাজেই এখানে একটি ব্রিগেড রাখা হ'য়েছে। (এক একটি ব্রিগেডে দুই থেকে চারটি ব্যাটালিয়ন বা রেজিমেণ্ট বা ব্যাটারি থাকে)। ফর্টিনাইন্‌থ বেঙ্গলীজ এখানে এসে হ্যাম্পশায়ার রেজিমেণ্টের কাছ থেকে সমস্ত চার্জ বুঝে নিলে। হ্যাম্পাশায়ার রেজিমেণ্ট চ'লে যাবার পর দেখা গেল অনেক যুদ্ধসম্ভার বা অ্যাম্যুনিশন তারা ফেলে গেছে। ঝড়ের পর আম কুড়োনর মত আমরাও তাদের ফেলে যাওয়া কার্ট্রিজগুলো কুড়িয়ে নিলাম।

স্থানটিকে বেশ স্বাস্থ্যকর ও নির্জ্জন ব'লে মনে হ'ল। প্যারেড গ্রাউণ্ডের জন্য মাঠের মাঝখানে জায়গা রেখে চারদিকে আমাদের তাঁবু পড়ল। চা, চিনি, টিনের দুধ, আটা, টিনের মাংস প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে। এখনও বাংলা-দেশের মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে নানারকম জিনিষ আস্‌ছে।—সুতরাং সব দিক দিয়েই জায়গাটা বেশ ভাল লাগছে।

তবে একেবারে নিরুপদ্রব নয়। আরবী দস্যুদের উৎপাত এখানে বেশ। সুযোগ ও সুবিধা পেলেই ট্রেনে হোক বা ক্যাম্পে হোক—হানা দিয়ে যা কিছু পায় লুট ক'রে নিয়ে যায়। এদের বন্দুকের হাতও খুব চমৎকার। ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে আমাদের বাসস্থানের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত ছিল। তারই পাশে লম্বা ট্রেঞ্চ মাঝে মাঝে আছে। ট্রেঞ্চের ভিতর ছোট ছোট মাটির ঘর। ঐ ঘরের ছাদ ও আশপাশ বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা। বাঙালী সৈনিকেরা পালা ক'রে এই সব ট্রেঞ্চের ভিতর দিনের পর দিন কাটাতে লাগলো।

এখানে এসে সকলেরই স্বাস্থ্যের আশানুরূপ উন্নতি হ'ল। অবসর মুহূর্ত্তগুলি আমাদের বেশ আনন্দে কেটে যেত। আমাদের দলটিতে বহু ওস্তাদ ছেলে ছিল। কেউ ফুটবল, হকি খেলোয়াড়, কেউ গায়ক, কেউ বাদক, কেউ নৃত্যশিল্পী, কেউ বক্তা, কেউ অভিনেতা, কেউ যাদুকর। এই ধরণের জমিয়ে রাখ্‌বার মত লোক প্রায় সবাই।

প্যারেড দুই বেলাই হচ্ছে। কখন কখন বহুদূর গান গাইতে গাইতে 'রুটমার্চ' করতাম। মোট কথা সর্ব্বদা একটা না একটা হৈ চৈ লেগেই আছে! বসরা ছেড়ে পর্য্যন্ত আর অরুণের সঙ্গে এক তাঁবুতে থাকা ঘটেনি কারণ সে থাকৃত বি কম্পানিতে আর আমি থাকৃতাম "সি" কম্পানিতে।

একদিন রাত একটার সময় আমাকে রাউণ্ডে যেতে হ'বে দূরে অবস্থিত সেই ট্রেঞ্চে। লাষ্ট পোষ্টের বাঁশী বাজার পর একটু
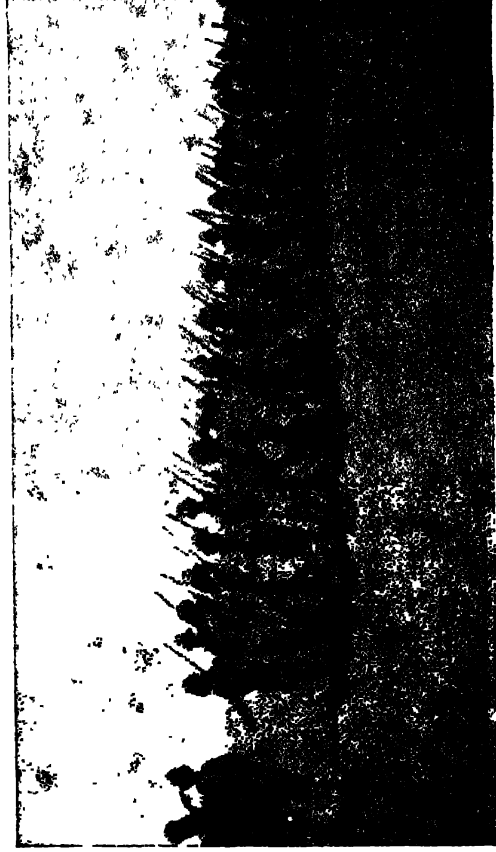
মেসোপটেমিয়ায় ৪৯ সংখ্যক বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের সৈন্যদলের একাংশ।

ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম। রিভলভার, ক্রসবেল্ট্ ও টুপীটা পাশেই পড়েছিল। যথাসময়ে সে সব নিয়ে অন্ধকারে রাউণ্ডের অভিসারে যাত্রা করলাম। ভীষণ অন্ধকার—তাঁবুর মধ্যে সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে—মাঝে মাঝে প্রহরীদের বুটের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। দূরে ট্রেঞ্চ থেকে মাঝে মাঝে গুলির শব্দ আসছে। আমি ধীরে ধীরে 'বি' কম্পানির লাইনে অরুণের তাঁবুর কাছে এলাম—সেখানে উঁকি মেরে দেখি—অরুণ ড্রিট্‌জ লণ্ঠন জ্বালিয়ে সেই গভীর রাত্রে তন্ময় হ'য়ে চিঠি লিখ্‌ছে। আমি একটি তুড়ি দিলাম। অরুণ চম্‌কে উঠে ব'ল্‌লে, কে?

তার সঙ্গে আলাপ করতে করতে রাত দুটো বেজে গেল। আমিও বেরিয়ে প'ড়্‌লাম। মাঠের মাঝখানে এসে পড়েছি, হাতে রিভলভার—চলেছি সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে। মাথার উপর অগণিত নক্ষত্র। এমনি ভাবে সেই পারিপার্শ্বিকে সে এক অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি। মনে দার্শনিক প্রশ্ন জাগে, কিন্তু তখন ভাব-বিলাসের সময় নয়। তা ছাড়া তখুনি 'গুড়ুম' ক'রে এক আওয়াজ হ'ল। বুঝলাম কাছেই ট্রেঞ্চ। একটু এগুতেই প্রহরী (সেন্ট্রি) চীৎকার ক'রে উঠল' "হু কামস্ দেয়ার?" (**Who comes there?**) আমি সেইখানে দাঁড়িয়েই উত্তর দিলাম ভিজিটিং রাউণ্ড।' প্রহরী চেঁচিয়ে উঠল, 'গার্ডস্ টার্ণ আউট।' যারা পাশে ঘুমিয়ে ছিল তারা জেগে উঠে নিজেদের বন্দুক হাতে ক'রে এক লাইনে দাঁড়াল। গার্ড কম্যাণ্ডার একবার নিজে এদের পরীক্ষা ক'রে আবার চীৎকার ক'রে বলে উঠল, 'পাস ভিজিটিং

রাউণ্ড, অলস্ ওয়েল’। (Pass, Visiting Round all's well.) এইভাবে গার্ড কম্যাণ্ডারকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেঞ্চের প্রত্যেক পোষ্ট পরীক্ষা করলাম। দেখ্‌লাম সব ঠিক আছে। সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতা—সবাই মেনে চলে—সবাইকে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য যন্ত্রের মত করতে হয়। এরই মধ্যে আমাদের যে আনন্দ সে আনন্দ জীবনে আর কোন অবস্থায় উপভোগ করিনি। কারণ ব্যক্তিগত জীবনের এই অবসর মুহূর্ত্তগুলি একেবারে বাধাহীন মুক্ত বায়ুর মত। আমাদের দেহের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ড ক’রে বাতাসের চাপ। এই চাপ সহ্য করবার মত ক’রেই দেহটা তৈরী—দেহের ক্রিয়া এ’তে সুনিয়ন্ত্রিত থাকে। তেমনি আমাদের জীবন। সাংসারিক নানা দায়িত্বের চাপ সহ্য করাই আমাদের অভ্যাস। হঠাৎ বায়ুব চাপ দেহ থেকে সরিয়ে নিলে দেহের যেমন মারাত্মক দুর্দ্দশা ঘটে—হঠাৎ সাংসারিক সকল চাপ মন থেকে সরিয়ে নিলে মনেরও সেই রকম দুর্দ্দশা ঘটে। সে যে কি মারাত্মক আনন্দ তার অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝানো শক্ত। এত আনন্দ সহ্য করাই মুস্কিল। সামরিক গুরুদায়িত্ব না থাকলে হয়ত আমরা আনন্দের আতিশয্যে পরস্পর মারামারি ক’রে দিন কাটাতাম!

বাঙালী যুবকদের চালচলন একেবারে বদলে অভিজ্ঞ সৈনিকদের মত হয়ে গেছে। এই সময় নতুন যদি কেউ তাদের দেখত তাহ’লে বুঝতেই পারত না যে এদের পিছনে আছে মাত্র ১১ মাসের শিক্ষা! তা ছাড়া বাঙালী সৈনিকদের মনে একটা আদর্শবাদ ছিল। এরা শুধু যন্ত্রবৎ সাধারণ সৈনিকদের মত ছিল না।

কাজেই এরা মেসোপটেমিয়ার প্রত্যেক ভারতীয় বা ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট যখন যাদের সংস্পর্শে এসেছে তাদের সঙ্গেই এরা খুব ভাব জমিয়ে তুলেছে।

শত্রুপক্ষীয় সংঘর্ষের সামান্য সামান্য অভিজ্ঞতা আমাদের যা হয়েছে তা পূর্ব্বে বলেছি। তুর্কী বিমান থেকে বোমা ফেলার কথা বলা হয়েছে। এইবার আর একটি নতুন অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ভীষণ গুলির আওয়াজে। একদল আরবী, রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে একটি চলন্ত ট্রেন আক্রমণ করেছিল। ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ট্রেঞ্চে প্রকৃতি ঘোষের অধীন অমিয় হালদার প্রভৃতি একটি সেকশন ডিউটিতে ছিল। আরবীরা অন্ধকারের মধ্যে ট্রেন লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়ছিল। তা শুনে ট্রেঞ্চ থেকে প্রকৃতি ঘোষের সেকশন সেই অন্ধকারে গুলির আওয়াজ লক্ষ্য ক'রে বন্দুক চালাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল এদের ফায়ারিং কার্য্যকরী হয়েছে—সমস্ত আরবী দস্যুরা ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে গেল। সেই রাত্রে ট্রেনখানি আরবী দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পেল। রক্ষা না পেলে ভয়ানক ক্ষতি হ'ত, কারণ ঐ ট্রেনে অনেক বন্দুক ও গুলির বাক্স ছিল।

সৈন্যদের সম্বন্ধে একটি কথা বলা হয় নি। সামরিক প্রথা অনুযায়ী কোন পল্টনকে একই জায়গায় বেশিদিন থাকতে দেওয়া হয় না। তাতে সৈন্যদের স্বাস্থ্য ও মনের প্রফুল্লতা অটুট

থাকে। তা ছাড়া এক জায়গায় বেশিদিন থাকলে জীবনটা একঘেয়ে হ'য়ে ওঠে—মানসিক অবসাদ এবং কুঁড়েমি জন্মাতে পারে—সেই জন্যেই বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থান এবং পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাকে বার বার স্থাপন করতে হয়। শিক্ষাও যাতে একঘেয়ে না হয় সেজন্যে নানা প্রকার নতুন নতুন ব্যবস্থা করতে হয়। সামরিক বিদ্যা বর্ত্তমানে একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এর নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কৃত হচ্ছে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে,—সুতরাং সামরিক বিদ্যা শিক্ষারও কোন শেষ নেই এবং হবেও না, কারণ এর সীমা কখনও নির্দ্দিষ্ট হবে না। তবে পৃথিবী থেকে যদি কোনদিন যুদ্ধ উঠে যায় তা হ'লে হয়ত তা সম্ভব হবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই আদেশ এল ফর্টিনাইন্থ বেঙ্গলীজ্ কুট-এল-আমারাতে বদলি হয়েছে। কুট-এল-আমারাকেই সংক্ষেপে কুট বলা হয়। ১৯১৬ সালের ২৮শে এপ্রিল জেনারেল টাউনশেণ্ডের সঙ্গে আর্ত্তসেবকদলের বাঙালী যুবকেরা তুর্কী কম্যাণ্ডার খলিল পাশার হাতে বন্দী হয়েছিল এইখানেই। এক সময় তাদের মাসের পর মাস ঘোড়ার মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছিল। কুটের প্রায় সর্ব্বত্রই মাইলের পর মাইল ট্রেঞ্চ কাটা, সেইজন্যে স্থানটি খুব উঁচু নীচু। ট্রেঞ্চগুলি কোনও রকমে মাটি দিয়ে ভর্ত্তি করা হয়েছে। এখানে এখন কতকগুলি ব্রিটিশ ও ভারতীয় রেজিমেণ্ট রয়েছে। আমাদের ক্যাম্প পড়ল ঠিক টাইগ্রিস নদীর তীরে। নদীর অপর পারে একটি সেকশনের শিবির স্থাপিত হ'ল। আমাদের দুটো তাঁবু খাটাবার বন্দোবস্ত

হ'ল। কিন্তু খাটাতে গিয়ে দেখি ভয়ানক ব্যাপার! কোদাল দিয়ে জমি সমান করতে গিয়ে এক জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়ল একটি বুট—মরা মানুষের পা আর একজায়গায় দাড়িওয়ালা একটা মাথা! এইভাবে খণ্ড খণ্ড নরদেহের বিকৃত অংশের বীভৎসতা দেখতে দেখতে মনটা বিষিয়ে উঠল। শেষে উপায়ান্তরহীন হ'য়ে বললাম—এইখানেই তাঁবু খাটা। অগত্যা তাই করতে হ'ল। সেই অসংখ্য মৃতের সমাধিক্ষেত্রের উপর নবাগত মানুষের হ'ল বিচরণ ক্ষেত্র! জীবন-মৃত্যুর এই লীলাই ত চলছে বিশ্ব জুড়ে!

তাঁবুর ভিতরটা কাদা দিয়ে নিকিয়ে দেওয়া হ'ল। তার উপর পড়ল আমাদের বিছানা। প্রায় কাপালিকের শব সাধনার মতই হ'ল ব্যাপারটা।

আমাদের রাত্রির খাবার একটি নৌকায় ক'রে ওপার থেকে দিয়ে গেল। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। তাঁবুর চারিদিকে প্রহরীদের নিযুক্ত ক'রে আমি আমার তাঁবুতে চলে এলাম। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে খেতে গিয়ে চক্ষুস্থির হ'য়ে গেল। ফণী দত্তকে একচোট গালাগালি দিয়েও মন শান্ত হ'ল না। পাঠিয়েছে কি না হাতে তৈরী খস্‌খসে রুটি আর টিনে রক্ষিত মাংস। কিন্তু আগুনের কাছে সবই পবিত্র—জঠরে যে আগুন জ্বলে উঠেছে তার কাছে ও সব পবিত্র হ'য়ে গেল। মনে হ'ল যেন শ্মশানে বসে প্রেত-সাধনা করছি।

সৈনিক জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে এটাও

একটি। স্থান-কাল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করলে তখন এটা বিশেষ অসম্ভব বা অস্বাভাবিক মনে হয় না। পরে ভাবতে গেলে বিস্ময় বোধ হয়।

ওপারে লাস্ট পোস্ট বেজে উঠল। আমরা শুয়ে পড়লাম। শুয়ে কেবলি মনে হ'তে লাগল, যেন সমস্ত মাটি ভেদ ক'রে সেই পা, সেই বিকৃত মুণ্ড, সেই কাটা হাত বেরিয়ে আসছে। খণ্ড দেহের শরশয্যায় শ্রদ্ধেয় ভীষ্মের মতই চুপচাপ পড়ে থাকা ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না—তারপর যথা সময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ পাশে সিপাহীদের তাঁবু থেকে একটি সৈনিকের গলার আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি উঠে পড়লাম। তারপর প্রহরীকে ডেকে আস্তে আস্তে ওদের তাঁবুতে ঢুকে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলাম। একটি সৈনিক বললে সার মাটির নীচে কি যেন নড়ছে! আমি তাকে বললাম, ওটা তোমার মনের ভুল—ওটা কিছু না। সে বললে, না সার, আমি ঘুমুতে পারছি না—সত্যিই কি যেন নড়ছে। এতক্ষণ অন্ধকারেই কথাবার্ত্তা চলছিল, এইবার আমি পকেট থেকে দেশালাই বের ক'রে কাঠি জালতেই দেখি প্রায় এক-হাত প্রমাণ একটি প্রকাণ্ড মোটা ইঁদুর ছেলেটির বিছানার পাশেই প্রকাণ্ড গর্ত্ত খুঁড়ে বাইরে আসবার চেষ্টা করছে—বিছানায় বাধা পেয়ে উঠতে পারছে না। আমাদের দেখে সে বেচারা করুণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

ফর্টিনাইন্‌থ্‌ বেঙ্গলীজ ৭ ও ১৬নং রিডাউট, রাইট ব্যাঙ্ক, ব্রিগেড ডিফেন্স এবং টার্কিশ প্রিজনার্স ক্যাম্প, প্রভৃতি স্থানে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। কুট স্থানটি কিন্তু মোটেই স্বাস্থকর ব'লে মনে হ'ল না। তা ছাড়া মাঝে মাঝে টাইগ্রিস নদীর জল বেড়ে গিয়ে ক্যাম্পের ভিতর জলে জলময় হয়ে যেত। কখনও বা তাঁবু পড়ে গিয়ে বিব্রত ক'রে তুলত। সেই কারণ ক্যাম্পকে বাঁচাবার জন্য নদীর ধারে বাঁধ বাঁধতে হত। এইখানে একদিন রাত্রে টাইগ্রিস নদীর জল হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট সারারাত কঠোর পরিশ্রম ক'রে বাঁধ বেঁধে কুটের ব্রিগেডকে জলপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিল। রক্ষা না করলে ব্রিগেডের অনেক ক্ষতি হ'ত। এই কাজের জন্য বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট কুটের ব্রিগেডিয়ার জেনারলের কাছ থেকে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছিল।

টার্কিশ প্রিজনার্স (বন্দীদের) ক্যাম্প—অসংখ্য তাঁবু সারি সারি খাটানো। ক্যাম্পের চারিদিক কাঁটা তারের বেড়ায় পরিবেষ্টিত। প্রায় ১২০০ তুর্কী বন্দী এই ক্যাম্পে। বাঙালী সৈনিকেরা এই বন্দীদের গার্ড দিচ্ছে। এই সব বন্দীর যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সে জন্য কুটের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। দেখেছি বন্দী অবস্থায় অন্যদিকে সুখে থাকলেও মনের মধ্যে ওদের একটা নিরাশার ভাব সর্ব্বদাই জেগে থাকত। কোথায় কবে এ যুদ্ধের শেষ তা তারা জানে না, তাই মাঝে মাঝে কেউ কেউ হতাশ ভাবে জিজ্ঞাসা করত,

কবে লড়াই শেষ হবে। ওদের একমাত্র সান্ত্বনা একসঙ্গে এতগুলো স্বজাতি স্থান পেয়েছে। বন্দীরা বন্দীত্বের গ্লানি ভোলবার জন্য নিজেদের মধ্যে আমোদ আহ্লাদ করত। সকালে চা-রুটি, দুপুরে মাংস রুটি ও ডাল ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে খেতে পেত। প্রত্যেককে দুটো করে মোটা কম্বল দেওয়া হয়েছিল। জামা কাপড়ও নতুন দেওয়া হয়েছিল। এদের প্রায় সকলেই সুপুরুষ—রং ফরসা, শরীর বেশ মজবুৎ। তুর্কিরা খুব ভাল যোদ্ধা। কুড়ি থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এদের বয়স। দু'একজন ভাঙা ভাঙা ইংরেজীও বলতে পারত। তা'ছাড়া কথাবার্ত্তা ইসারায় চালাতে হ'ত। দিনের বেলা কয়েক ঘণ্টার জন্যে রাস্তা তৈরী, নদীর বাঁধ বাঁধা প্রভৃতি কাজ এদের দেওয়া হ'ত। বেলজিয়ামে জার্মানরা যে ভাবে বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিল, সে তুলনায় এরা অনেক সুখী ছিল।

প্রায় সকল দেশেই সৈন্যদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে হঠাৎ সাময়িক ভাবে উন্মাদ হয়ে পড়ে। ইংরেজীতে 'run amock' ব'লে একটা কথা আছে। কথাটি এই জাতীয় সাময়িক উন্মাদদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাদের সৈন্যদের মধ্যেও একদিন দুজন হঠাৎ এইভাবে ক্ষেপে সামনে যাকে পেয়েছে বেপরোয়া গুলি চালিয়েছিল। তার ফলে একজন নিহত এবং দুজন আহত হয়। এরকম যে কেন হয় তা কেউ বলতে পারে না। এরকম যে শুধু সৈন্যদের মধ্যেই হয় তা নয়, সাধারণ লোকের মধ্যেও হয়।

আর একদিনের আর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি। একদিন ভোর বেলায় মাঠের মধ্যে গোলা ফাটার আওয়াজ হ'ল। আমরা সৈনিক—যে-কোন অবস্থার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হ'য়ে আছি। যুদ্ধক্ষেত্রের একটু বাইরে আছি বটে—কিন্তু যে কোন মুহূর্ত্তে সেইটেই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে—এজন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হয়। কাজেই কোথায়ও অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই আমরা তার প্রতিবিধান করতে এগিয়ে যাই। যে শব্দটা শুনলাম তাতে আমাদের শিবির কেঁপে উঠল। তাইত! এখানে কামানের গোলা এল কোথেকে! তাঁবুর বাইরে এসে দেখি দূরে মাঠের মাঝখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বিমান থেকে বোমা ফেলেনি—কেননা তা হ'লে জানতে পারতাম। একটু পরেই ধোয়া মিলিয়ে গেল। তারপর সংবাদ পাওয়া গেল সাঙ্ঘাতিক। মাঠে লাইভ্ শেল্ (live shell) বা 'জ্যান্ত' কামানের গোলা পড়েছিল। তিনজন ঘোড়সোয়ার মাঠ অতিক্রম করছিল। মাঠটা অসমতল এবং ঘাসে ভর্ত্তি ছিল। গোলাটা ছিল তারই মধ্যে অদৃশ্য হয়ে। ঘোড়ার খুরের ধাক্কায় গোলাটা ফেটে গেছে—এবং তার ফলে তিনটি মানুষ এবং তিনটি ঘোড়ার জীবনান্ত ঘটেছে! এর পর থেকে বিগ্রেড হ'তে বন্দোবস্ত হ'ল মাঠ থেকে ঐ ধরণের লাইভ শেল, কার্ট্রিজ, হাতে ছোঁড়া বোমা বা হ্যাণ্ড গ্রেনেড প্রভৃতি কুড়িয়ে মাঠ পরিষ্কার করতে হবে। সৈনিক জীবনের স্মৃতির মধ্যে যেমন এই সব ভয়ঙ্কর জিনিসের কথা বলছি তেমনি ছোট-

জমাদার প্রতাপচন্দ্র রায়।
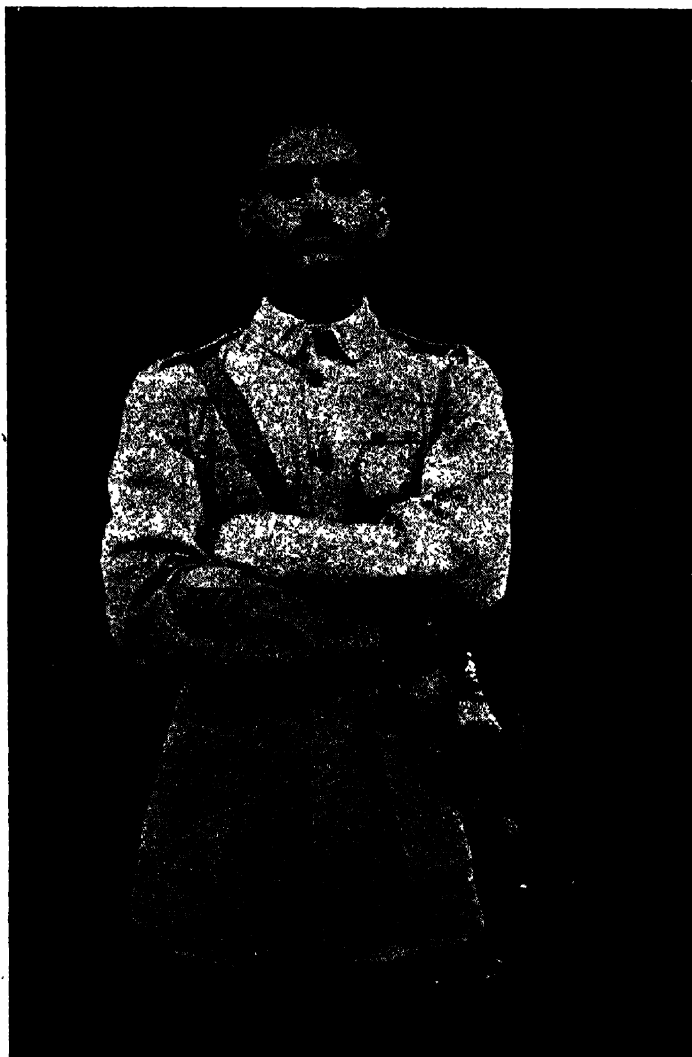
খাটো অনেক জিনিসও অত্যন্ত মধুর এবং বড় হয়ে স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হ'য়ে আছে। একটির কথা বল্‌ছি।

একদিন দুপুরবেলা ডিউটি শেষ ক'রে ক্যাম্পে ঢুকে জমাদার নবাব সাহেবের তাঁবুর পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখি সুবেদার ভূপেন ঘোষাল প্রভৃতি কয়েকজন অফিসার এবং এন-সি-ও— কারো হাতে নূতন মোজা, কারো হাতে নূতন রুমাল, কারো হাতে গেঞ্জি, কারো হাতে সিগারেটের এক একটি টিন। ভূপেনকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল নবাব সাহেবের তাঁবুতে নিলাম হচ্ছে। আসলে যা হচ্ছে তা তাঁবুর ভিতরে গিয়ে জানতে পারলাম। নবাব সাহেবের নামে একটি প্যাসেল এসেছে তার মধ্যে ঐ সব জিনিস ছিল—তিনি প্যাকিং বাক্সের উপর বসে সেগুলো সৈনিকদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন। প্রায় প্রতি মাসেই তিনি পার্সেল পেতেন এবং এইভাবে জিনিস দান করতেন।

কিছুদিনের মধ্যে করাচী থেকে আরও প্রায় ৮০০ বাঙালী যুবক মেসোপটেমিয়ায় এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হ'ল। ইতিমধ্যে আমাদের পল্টনের অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছিল। কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল ব্যারেট ছুটি নিয়ে আফ্রিকায় চলে গেলেন। মেজর স্যাণ্ডিফোর্ড লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেলের পদে উন্নীত হ'য়ে পল্টনের কম্যাণ্ডিং অফিসার হ'লেন। অনেকেই সিপাহী থেকে এন-সি-ও, এন-সি-ও থেকে জমাদার এবং জমাদার থেকে সুবেদার পদ প্রাপ্ত হয়েছে। সুবেদার অধিক্রম মজুমদার সুবেদার মেজর পদে উন্নীত হয়েছে। এখান থেকে প্রভাতচন্দ্র

রায়, মণি মজুমদার, মোহিতকুমার মুন্সী প্রভৃতি সিনিয়ার হাবিলদারদের "আমারা" নামক স্থানে বেয়নেট ফ্রাইটিং, মাসকেট্রী ও ফিসিক্যাল প্রভৃতি স্পেসাল ট্রেনিংএ পাঠান হয়েছিল।

এই সময় আমি ছুটির দিনে মাঝে মাঝে দু একজন সিপাহী সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্প থেকে দূরে মাঠের মাঝে বেড়াতে যেতাম। সেখানে দেখ্‌তাম আরবীরা তাদের গৃহপালিত পশু—ভেড়া, দুম্বা প্রভৃতি নিয়ে দলে দলে চরিয়ে বেড়াচ্ছে। আরবীরা এখন বেশ নিশ্চিন্ত মনে তা'দের ঘর সংসার ক'রে যাচ্ছে। কোন রকম ভয় ভাবনা নেই। একদিন এক আরবী বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হ'তে সে ভাঙা ফার্সিতে আমাকে কুটের যুদ্ধ বিষয়ে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প ব'লেছিল। তারই মধ্যে একটি গল্প আমি উল্লেখ করছি। সে বল্‌লে, সবেমাত্র কুট ইংরেজরা দখল করেছে। কুট থেকে প্রায় দশ বারো মাইল দূরে তুর্কী সৈনিকেরা ট্রেঞ্চে ব'সে আছে কুটের চতুর্দ্দিকে ইংরেজ সৈন্যও মাঝে মাঝে বসে আছে। এই ভাবে ওদের যুদ্ধ চল্‌ছে—দুপক্ষ থেকেই কামান ছাড়া হচ্ছে—একদিন চাঁদনী রাতে ইংরেজ পক্ষের এক প্রহরী হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে—নদীর পাড় থেকে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ গজ দূরে জলের মধ্যে একটা মাটির হাঁড়ি ভাস্‌তে ভাস্‌তে পাড়ের দিকে আসছে। হাঁড়ির গতি ঠিক স্রোতের অনুকূল নয় দেখে তার কেমন সন্দেহ হ'ল। ক্রমে হাঁড়িটা পাড়ের দিকে এল। প্রহরীর হাতে বন্দুক। দেখা যাচ্ছে হাঁড়ি অথচ হাঁড়ির মত অচেতন নয়, ব্যাপার কি? দেখাই যাক্ ব্যাপার কি—মনে ভেবে, হাঁড়ি লক্ষ্য

ক'রে গুলি ছুঁড়্লে। তারপর সে কি কাণ্ড! যেন জ্যান্ত কাছিম গুলি খেয়ে জল তোলপাড় কর্তে লাগল। প্রহরীর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। তখন সে আর একজন প্রহরীকে ডেকে নিয়ে সেইখানে গিয়ে দেখে একজন তুর্কী সৈনিক জলের ধারে মরে পড়ে আছে। আর সেই ভাঙা হাঁড়ির টুক্রো তার আশে পাশে ছড়ান। পরে আবিষ্কৃত হ'ল সে একজন তুর্কী গুপ্তচর। ইংরেজ সৈন্যের অবস্থান ও গতিবিধি জানবার জন্য এই অদ্ভুত ছদ্মবেশে নদী পার হয়ে আস্‌ছিল।

যুদ্ধে 'স্পাই' সম্বন্ধে যে সব রোমহর্ষক ঘটনা আমরা শুনেছি—তার মধ্যে এই তুর্কী স্পাই সকলকে হার মানিয়েছে! এরকম গুপ্ত অভিযান বোধ হয় আর কোন গুপ্তচরের পরিকল্পনায় স্থান পায়নি।

শিক্ষার জন্য ডেভনশায়ার রেজিমেণ্ট থেকে বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের বিভিন্ন কম্পানিতে দু একজন ক'রে ব্রিটিশ শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিল। এদের খাওয়া থাকার জন্য পৃথক তাঁবু দেওয়া হয়েছিল। বাঙালীদের সঙ্গে এদের ব্যবহার খুব চমৎকার ছিল। অবসর সময়ে সবার সঙ্গে এরা খেলা-ধূলো করত এবং প্রাণ খুলে মিশত। তাদের শিক্ষার জন্যও এরা যথেষ্ট খাটত। এইভাবে এদের সঙ্গে আমাদের সকলেরই একটা সৌহার্দ্দ্য গড়ে উঠেছিল। বাঙালী রেজিমেণ্টের যাবতীয় কাজ ইংরেজীতে হওয়ায় এই সব শিক্ষকদের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। আমার সি-কম্পানিতে যে শিক্ষক ছিল তার নাম সার্জেণ্ট ডব্‌লিউ সি বডি। সে আমার

চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিল। সে যেদিন তার রেজিমেণ্টে ফিরে যায় সেদিন তার বড় দুঃখ হয়েছিল। যাবার দিন সি-কম্পানির সিপাহীরা তাকে কুট ষ্টেশন পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। এই সময় ডেভনশায়ার রেজিমেণ্টের গ্যারিসন নাসিরিয়া নামক স্থানে ডিউটিতে ছিল। স্থানটি ইউফ্রেটিস নদীর তীরে।

সেইখান থেকে সার্জেণ্ট বডি আমাকে অনেক চিঠি লিখেছিল। আমাদের উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল এবং সৈনিক হিসাবে আর এক সৈনিককে সে কি রকম উৎসাহ দিত—এবং রাজার সম্মান রাখবার জন্য তার কি রকম আগ্রহ ছিল তার নিদর্শন স্বরূপ একখানা চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি।

Sergt. W. C. Boddy
265.023 'C' Coy
1/6 Devon Regt.
Mes. Ex. Force
Nasiriyeh
28 8-18.

Dear Subedar M. B. Singh,

I dare say you will be surprised to hear from me after keeping you waiting so long for this letter, which I promised to write to you when I left you at Kut, I must apologise for not writing to you before, but have been very busy since rejoining my Battalion, in fact we have been kept training from morning to night, but of course

we can't do so much now because of the heat. Of course when we left you, we naturally thought we were being called back to the Regiment, because they were shifting out of the country, but when we got to Nasiriyeh we found no signs of our Battalion shifting. Worse luck. We also found we had a new Colonel and it appears he is a man who wants all his men with his Battalion. So that is the only reason why we were recalled.

I hope I shall have the pleasure of having a letter from you, just to let me know how you and the other officers and men of your Company are getting on. I must say whilst I was with you, I was treated with every consideration by all ranks, in fact I was very sorry to leave you, and I am sure Sergt. Tucker and Hancock were, Please remember me to all the N. C. O.'s, and men of your Company and tell them I wish them the best of luck and hope they are still doing their best for their King Emperor and Country, and hope when they go into action they will keep up the glorious tradition of the Indian Empire which I am positively sure they will do.

I think I must bring this letter to close, hoping you are keeping in the best of health, glad to say I am. I remain

Yours truly,
(Sd.) W. C. Boddy
(Sergt.)

আমাদের এক লক্ষ্য—আমরা সবাই একই উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বিদেশে মিলিত হয়েছি, আমাদের সবারই স্বার্থ এক—এই ধারণাই আমাদের আন্তরিক মিলন ঘটায়।

এতদিনে যুদ্ধের ঝড় মেসোপটেমিয়ার উপর দিয়ে ব'য়ে গিয়ে এখন সেখানকার আবহাওয়া একটু শান্তভাব ধারণ করেছে। সৈন্যেরা এইবার একটু জিরিয়ে নেবার অবসর পেয়েছে। যুদ্ধের সন্ত্রস্ত ভাবনা ছেড়ে শান্ত হয়ে বসলে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রটাকে কি ভয়ানক মনে হয়! মনে হয় যেন বিরাট শ্মশানক্ষেত্রে ব'সে আছি। কত পিতা মাতা—কত পত্নী, কত সন্তানের মর্ম্মভেদী হাহাকার যেন এই শ্মশানক্ষেত্রের হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

এদিকে তুর্কী সৈন্যেরা পরাজিত এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে কুর্দিস্থান পার্সিয়া প্রভৃতি স্থানে পালিয়ে গেছে। ব্রিটিশ পক্ষে মেসোপটেমিয়ার সমস্ত স্থানে ব্রিটিশ পতাকা উড়ছে। সৈন্যদল নিশ্চিন্তে এক স্থানে থেকে আর একস্থানে চলাচল করতে আরম্ভ করেছে। ফর্টিনাইন্‌থ্‌ বেঙ্গলীজকে বস্‌রার একটি শহরতলী তনুমা নামক স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইখানে আমরা বিভিন্ন ভারতীয় ও ব্রিটিশ রেজিমেণ্টের সঙ্গে গ্যারিসন ডিউটিতে নিযুক্ত হলাম। কলকাতার ফোর্টে যে ভাবে সৈনিকেরা জীবন কাটায় এখানে এসে আমরাও সেইভাবে জীবন কাটাতে লাগলাম। মাঝে মাঝে রুটমার্চ হ'ত। মার্চের সময় সিপাহী কীর্ত্তি বাহাদুর সিংহের রচিত এই গানটী গাইতাম ঃ—

বাঙালী পল্টন

লেকার খাঞ্জার মারো দুশ্‌মন্ 'পর
বাঙালী পল্টন।

কেয়া চাল চালা হ্যায়,
(পাক্কা) সিপাহী বনা হ্যায়,—
বাঙালী পল্টন।

দেশ্ দেশ্‌সে আয়ে ভাই,
দুশ্‌মন্'কো দেশ্‌মে,
কেয়া দেশ্‌কা লিয়ে রাজ্‌কা লিয়ে,
নাম্‌কা লিয়ে
বাঙালী পল্টন।

ঘর বি ছোড়া, দোর বি ছোড়া,
ছোড় দিয়া পিয়ার
বেল্টকা ভিতর পাউচ্ ভর্‌কে
সিনে ব্যাণ্ডোলিয়ার
হাত্‌মে রাইফেল্, গোলি ভর্‌কে
মারো দুশ্‌মন্ 'পর
বাঙালী পল্টন।

গাঁথি লেকে চামচ্ লেকে
ট্রেঞ্চ বানাকে, শির বাঁচাকে,
গোলি মারো দুশ্‌মন্ 'পর
বাঙালী পল্টন।

এই সময় ওয়াই-এম-সি-এ আমাদের যথেস্ট সাহায্য করেছিল। ঘরে খেলবার এবং বাইরে খেলবার নানারকম উপকরণ এরা যুগিয়েছিল। তারপর এল ৺পূজা। বাগদাদের মত এখানেও বাঙালী সৈনিকেরা পূজার আয়োজন করলে।

তারপর এল শীত এবং আগেই বলেছি এখানে শীত এবং বর্ষার একই সঙ্গে শুভাগমন। জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাঁবুর ভিতর আগুন জেলে কোন রকমে দিন এবং রাত কাটাচ্ছি। একটা কিছু না হ'লে ত আর বাঁচা যায় না, উত্তেজক কিছু। তুর্কীরা পরাজিত না হ'লে এই শীতকে শীত ব'লেই মনে হ'ত না। কিন্তু ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

১১ই নবেম্বর ১৯১৮ সাল! আজ সারাদিন বৃষ্টির বিরাম নেই। যে বাইরে থাকবার সে বাইরের ডিউটিতে আছে—অধিকাংশ সৈনিক নিজেদের তাঁবুর ভিতর ব'সে উত্তেজনাহীন ঠাণ্ডা দিন আগুন সংযোগে গরম করবার চেষ্টা করছে। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। আমিও তাঁবুতে বসে আছি—এমন সময় হঠাৎ বস্‌রার ছোট বড় জাহাজ এবং লঞ্চের সমস্ত বাঁশী এক সঙ্গে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আর্টিলারি ও বিমানধ্বংসী কামান গর্জন ক'রে উঠল। ক্রমাগত বন্দুকের আওয়াজ হ'তে লাগল। ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে। শীত কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে! আমাদের কম্যাণ্ডিং অফিসার তাঁর তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন যুদ্ধের বিরতি হয়েছে—আর্মিষ্টিস্ হয়েছে! শোনামাত্র আমরাও আনন্দে বন্দুক ছুঁড়তে লাগলাম। ব্রিটিশ

অফিসারগণ আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কেসের পর কেস্ ভেঙে মদের বোতল বের ক'রে বোতল ধরে মুখে ঢালতে লাগল। কেউ কেউ আনন্দে কাদায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। পল্টনের জন্যে এক পিপে মদ এল। যারা জীবনে কখনও মদ ছোঁয়নি তারাও এ অবস্থায় দু এক চুমুক মেরে দিলে।

বস্‌রাস্থিত সমগ্র রেজিমেণ্টের সৈন্যরা সেদিন সারারাত ধরে ঐ কাদার মধ্যে তাণ্ডবলীলার সৃষ্টি করলে। পরদিন দেখা গেল আমাদের ক্যাম্পের চারদিকে অসংখ্য খালি কার্ট্রিজের স্তূপ পড়ে আছে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছিল এই এক রাত্রের বহ্নি উৎসবে বাঙালী সৈনিকেরা প্রায় সাত হাজার গুলি ধ্বংস করেছে। এতদিন ধ'রে মনের এবং দেহের উপর দিয়ে যে চাপ গেছে তা থেকে, দম দেওয়া স্প্রিং হঠাৎ মুক্তি পেলে যেমন একমুহূর্ত্তে ভয়ানক শব্দ ক'রে নিজেকে বিস্তৃত করে শিথিল করে দেয়, তেমনি মুক্তি পেল আমাদের মন। আজ বিশ্বব্যাপী বে-হিসেবী আনন্দের দিন।

জার্মানি যে লোভ এবং হিংসা দিয়ে জগতের শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট করতে চেয়েছিল সেই প্রচণ্ড অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজ ন্যায়ধর্ম্ম বিজয় লাভ করলে। আনন্দ করতে হ'লে এমনি দিনেই ত করা উচিত। এ পর্য্যন্ত আমাদের আর একটা দিক সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। সেটা হচ্ছে স্পোর্ট বা খেলাধূলার কথা। সামরিক জীবনের এও একটা প্রধান অঙ্গ। বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের ফুটবল টিম সব স্থানেই বেশ সুনাম করেছিল। ভারতীয় সৈন্যেরা যে ফুটবল খেলতে পারে একথা মেসো-

পটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্যেরা প্রথমতঃ বিশ্বাসই করতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে একটা বেশ মজার কথা মনে পড়ল। আমরা যখন কুটে ছিলাম তখন ডেভনশায়ার রেজিমেণ্টও সেখানে ছিল। তারা ভাল ফুটবল খেল্‌তে পারতো। সেইজন্য আমাদের টিমের ক্যাপ্টেন তাদের ক্যাপ্টেনের কাছে বন্ধুভাবে একটা ম্যাচের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। এই না দেখে তারা তো হেসেই অস্থির! এবং কিছুতেই এই অসম্ভব প্রস্তাবে প্রথমে রাজী হ'ল না—পরে আমাদের কর্ণেলের কাছ থেকে তাদের কর্ণেলের নামে যখন সুপারিশ চিঠি গেল তখন নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে তাদের ফলোয়ারদের অর্থাৎ এই যেমন খানসামা, ধোপা, নাপিত, সহিস প্রভৃতির ভিতর হ'তে একটী টিম তৈরী ক'রে পাঠালো। বেচারীরা এসে কত যে গোল খেল্ তা আর গুণে উঠা যায় না। সম্ভবতঃ ১১।১২ গোল হবে। এর পরে বোধ হয় রাগ করেই একটী কম্পানি টিম পাঠাল। এরাও প্রায় ৭।৮ গোল খেয়ে হেরে গেল। এই খবর পেয়ে তারা তো রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে গেল এবং পরদিন রেজিমেণ্টের ফুল্‌টিম আমাদের সঙ্গে খেল্‌তে এলো। এবার ঠিক্ সমান সমান গোল হ'ল। এইভাবে খেলা বেশ জমে উঠ্‌ল।

আমাদের দলের ক্যাপ্টেন লং, সুরেন সেন, জিতেন মিত্র, বাঘা সোম (T. Shome, East Bengal, Mohan Bagan, E. B. Rly) ধীরেন মৈত্র (E. B. Rly) ও অবিনাশ দে

প্রভৃতি এবং হকিতে সুরেন সেন, শৈলেন বসু, বাঘা সোম, ভূপেন ঘোষাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

তারপর এ্যাথেলিটিক্ স্পোর্টেও আমাদের রেজিমেণ্টের বেশ সুনাম ছিল। স্পোর্টস্‌ম্যানদের মধ্যে নগেন ঘোষ, নরসিংহ রায়, অনিল মিত্র এবং জে, সি, নাথের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৬ষ্ঠ পর্ব্ব

এইভাবে ফর্টিনাইনথ্ রেজিমেণ্টভুক্ত বাঙালী সৈনিক দলের আমরা কলকাতা থেকে নৌসেরা, নৌসেরা থেকে করাচী—করাচী থেকে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে—বাগদাদ, আজিজি, কুট্-এল-আমারা এবং বস্‌রা প্রভৃতি স্থানে সৈনিক জাবনের সকল রকম গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার গৌরবের সঙ্গে বহন করে ১৯১৮ সালের যুদ্ধবিরতিরূপ শান্তির আনন্দময় প্রান্তে এসে পোঁছিলাম। যুদ্ধের প্রথম দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলে ফায়ারিং লাইনে যাবার সুযোগ আমাদের হ'ত, কারণ যুদ্ধের সকল শিক্ষাই আমরা পেয়েছিলাম। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন আসল ফায়ারিং লাইনের বাইরে যা কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজ সবই করবার অধিকার এবং সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিলাম। ইংরেজের ভাগ্যে বিজয়লক্ষ্মী যখন দেখা দিলেন, যুদ্ধের দানব সে সময় পলায়নোদ্যত। সে আমাদের শুধু স্পর্শ করে গেল—আর আমরাও তাকে শুধু পিছন থেকে তাড়া করলাম—সাম্‌নাসাম্‌নি মোলাকাত করবার সুযোগ পেলাম না। এইটিই তখন হয়েছিল আমাদের পরিতাপের বিষয়। কিন্তু যুদ্ধের বিরতি হলেও আমাদের ভাগ্যদেবতা বোধ করি আমাদের দুঃখ দেখে বিগলিত হ'য়েছিলেন, তাই তিনি আমাদের জন্য সেই বিরাট যুদ্ধনাট্যের বিরামের পরেও একটি পৃথক দৃশ্য আমাদের জন্য অবতারণা করলেন। যুদ্ধবিরতির পর সমগ্র পৃথিবী যখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে সেই সময়ে বাঙালী সৈনিকেরা

এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হ'ল। যুদ্ধবিরতির পর মাত্র ৬ মাস কেটেছে—সেই সময় কুর্দিস্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। ইতিপূর্ব্বে কুর্দিরা ইংরেজের পক্ষেই ছিল এবং সেই ভাবেই তারা তুর্কীদের উপর মাঝে মাঝে আক্রমণ করে তাদের বিব্রত ক'রত। যুদ্ধ বিরতির পর ব্রিটিশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাদের অবস্থার উন্নতি করবার জন্য তাদের আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই কুর্দিজাতি স্বভাবতই কারো বশ্যতা স্বীকার ক'রে অধীনে থাকতে পারে না।

সেই কারণে বিদ্রোহীদের নেতা শেখ মহম্মদ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌লো। এই ব্যাপারটি এমনই অতর্কিতে হয় যে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এই সংবাদ পৌছবার পূর্ব্বেই কুর্দিদের বিদ্রোহ অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য তৎক্ষণাৎ মেসোপটেমিয়া থেকে "কুর্দিস্থান এক্সপিডীশনারি ফোর্স" গঠন করে কুর্দিস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। ১৯১৯ সালের মে মাসের মাঝামাঝি একদিন খবর এলো ফর্টিনাইন্‌থ্‌ বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের একটি দলকে 'কুর্দিস্থান এক্সপিডীশনারি ফোর্সে' যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে। রেজিমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন কম্পানি থেকে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় অফিসার এবং ২১০জন সেপাই নিয়ে একটি দল গঠন করা হ'ল। কর্ণেল ভি, ভি, ভি স্যাণ্ডিফোর্ড স্বয়ং এই দল পরিচালনা করবেন। ব্রিটিশ ও ভারতীয় অফিসারদের নাম নীচে দেওয়া হ'লো— ক্যাপ্‌টেন ফিটজ্‌হারবার্ট, ক্যাপ্‌টেন জোন্স্‌ এবং—

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে মেসোপটেমিয়ার মরুভূমির বুকে
বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট আর্মি মার্চ করিয়া যাইতেছে।

"এ"—কম্পানী	জমাদার	প্রকৃতিকুমার ঘোষ
"বি" ,,	সুবেদার	প্রমথনাথ সাঁতরা
"সি" ,,	সুবেদার	মনবাহাদুর সিংহ
"ডি" ,,	সুবেদার	দুর্গাপদ ব্যানার্জ্জি
কোয়াটার মাষ্টার	সুবেদার	ফণীভূষণ দত্ত

সাব্ এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জেন—জোশী (মেডিক্যাল অফিসার)

যুদ্ধের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমরা ক্যাম্প থেকে মার্চ ক'রে ষ্টীমার ঘাটে এসে পৌঁছলাম। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ষ্টীমারে উঠ্লাম—ষ্টীমার ছেড়ে দিলে। আবার সেই পুরাতন জলপথ দিয়ে টাইগ্রিস নদীর উপর দিয়ে চ'লেছি। এসে পড়লাম কুট্-এল-আমারা। সেখান থেকে ট্রেনে হেনিডি নামক স্থানে—সেখান থেকে ফেরি ষ্টীমারে পার হ'য়ে এলাম বাগদাদ ষ্টেশনে। ষ্টেশনে আমাদের জন্য খোলা মালগাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশ্রামের সময় নেই, তৎক্ষণাৎ সমস্ত জিনিসপত্র সেই খোলা গাড়ীতে উঠিয়ে আমরাও উঠে পড়লাম। গাড়ী ছুটেছে মরু-ভূমির বুকের উপর দিয়ে—দীর্ঘ রেলপথ—মাথার উপর অগ্নিবর্ষী সূর্য্য। সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে গাড়ীর লোহাগুলিও অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠেছে, তার উপর আবার ভীষণ বালির ঝড় বইছে। এত কষ্টকেও যুবকেরা বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে মনের আনন্দে হাসি-মুখে হৈ হৈ ক'রতে ক'রতে চ'লেছে। এইভাবে পাঁচ দিনের দিন বিকালের দিকে আমরা এসে পড়লাম—বেইজী নামক স্থানে। সেই সময় বেইজী একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল। এর পর আর

কোনরূপ রেললাইন অথবা পায়ে চলার পথ পর্য্যন্ত নেই। কর্ণেল বলিলেন, "এখানে একটু বিশ্রাম করা দরকার।"

তখন গাড়ী থেকে যাবতীয় জিনিষপত্র নামিয়ে সেগুলি যথাস্থানে রেখে, চারিদিকে প্রহরী নিযুক্ত ক'রে সকলে নদীতে স্নান ক'রে নিজেদের ক্লান্তি দূর ক'রে গান সুরু করলে—

"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা নহি ত মেষ!"

এর পরে যা হয়েছিল--যে অপরিমেয় সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের পরীক্ষায় আমরা পাস করেছিলাম সে কথা ছেড়ে দিলেও—এই পর্য্যন্ত আমরা যেটুকু সহ্য করেছি—তা এখন ভাবতেও যেন প্রাণ কেঁপে ওঠে। অথচ সৈনিকের শিক্ষাই এমন যে সৈনিকের পোষাক যতক্ষণ পরা থাকে ততক্ষণ আমরা একেবারে পৃথক আর এক জাতি হ'য়ে পড়ি। সেই সময় অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাঙালী বাংলা দেশে সুখে থেকে হয়ত কল্পনাই করতে পারে না যে সেও সৈনিকজাতির মতই আচার ব্যবহার ডিসিপ্লিন এবং সহনশীলতা আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু যখন সে সামরিক শিক্ষা পেল তখন তার সঙ্গে অপর যে কোন জাতীয় সৈনিকের লেশমাত্র পার্থক্য আছে ব'লে মনেই করতে পারিনি। পার্থক্য যদি সত্যই থাকত—তা হ'লে কুর্দিস্থানের এই অপরিসীম কষ্টসাধ্য অভিযানে সে হেরে যেত—এবং তা'হলে তার এই গৌরবময় কাহিনী সগর্ব্বে লেখবার কোন সুযোগই পাওয়া যেত না।

স্নিগ্ধ সন্ধ্যা তার শান্ত আঁচল বিছিয়ে দিল মরুভূমির উপর। সে এক অপরূপ প্রশান্তি। কিন্তু সারারাত ঘুমনো যাবে, কাজেই সন্ধ্যায় বিশ্রামের গরজ কারো নেই। সবাই হৈ হৈ করছে। কিন্তু হায়! আর কিছু হোক না হোক সৈনিক জীবনে বিশ্রাম বিষয়ে কোন ভবিষ্যৎ বিশ্বাস না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষ ক'রে যুদ্ধে যাবার পথে।

অর্থাৎ প্রায় ৯½ টার সময়ে অফিসারদের প্রস্তুত হবার সঙ্কেত বেজে উঠল। সঙ্কেত বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কর্ণেলের কাছে উপস্থিত হতেই তিনি ব'ল্লেন, "আজ-ই রাত ১১ টার সময় এখান থেকে রওনা হ'তে হবে।" এই কথা শুনে আবার আমরা স্বাভাবিক, অবস্থায় ফিরে এলাম। অর্থাৎ দ্রুত খাদ্য গলাধঃকরণ, লটবহর বাঁধাছাঁদা ইত্যাদি—এইটাই সৈনিক জীবনের পক্ষে স্বাভাবিক, বিশ্রাম তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

ঠিক ১১টার সময় অন্ধকার রাতে সেই দুর্গম পথ ধরে আমরা মার্চ করতে লাগলাম। অসংখ্য নক্ষত্র মাথার উপর—চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম—কারু মুখে কথাটি কেই—শুধু কানে আসছে বুটের সমতাল ধ্বনি। এইভাবে সারারাত চলেছি—হঠাৎ মনে হ'ল পূবের আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছে—বুঝলাম ভোর হ'য়ে আস্‌ছে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজও বাড়তে লাগলো। আশে পাশে চেয়ে দেখি সকলের শরীরে এক পর্দ্দা ধুলো জমে গেছে।

বেলা প্রায় ৮টার সময় আমরা একটি নদীর কাছে এলাম। নদীর উপর একটি ছোট পুল। পুলটি পার হয়ে নদীর অপর পারে গিয়ে তাঁবু খাটানো হ'লো। এই স্থানটির নাম ফাত্তা।

ক্যাম্পের চারদিকে কড়া পাহারা নিযুক্ত করা হ'ল। ট্রান্সপোর্ট সেকশন্ খচ্চরের পিঠ থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে খচ্চরের সেবা অর্থাৎ দলাই মলাই করতে লাগল।

সুবেদার ফণী দত্ত তার লোকজন নিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করতে লাগল। ভীষণ গরম—তবে সান্ত্বনা এই যে সামনেই নদী দেখতে পাচ্ছি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নদীতে স্নান ক'রতে গেলাম। জল মুখে দিয়ে দেখি ভীষণ 'সল্‌ফারের' গন্ধ। স্নানের অর্দ্ধেক আরামই এইখানে মাটি হ'য়ে গেল। খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম। হুকুম হ'লো বিকাল ৪ টার সময় রওনা হ'তে হবে। ঠিক ৪ টার সময় তাঁবু গুটিয়ে আবার মার্চ সুরু হলো। এবার আমাদের পৌঁছুতে হবে 'লেসারজব' নামক একটি স্থানে। চলেছি মরুভূমির উপর দিয়ে—ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে—ধীরে ধীরে আমরা সেই অন্ধকারে মিশে গেলাম। অবিশ্রান্ত চ'লেছি, কোথায় পথের শেষ জানি না। চল্‌তে চল্‌তে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি—সে ঠিক ঘুম নয়—কেমন যেন আধো ঘুম আধো জাগরণের মত আচ্ছন্ন অবস্থা। ট্রান্সপোর্ট সেক্‌শনের কয়েক জন সেপাই খচ্চরের লেজ ধরে চ'লতে চ'লতেই ঘুমিয়ে নিচ্ছে—পাগুলি তাদের যন্ত্রের মত তালে তালে

এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা চ'লেছি বটে কিন্তু রাস্তা সে নয়! রাস্তার চিহ্ন কোথাও নেই—আমাদের সঙ্গে কোনও ম্যাপ অথবা পথ-প্রদর্শকও নেই। কম্যাণ্ডিং অফিসার, কর্ত্তৃপক্ষের যৎসামান্য নির্দ্দেশ, কম্পাস ও আকাশের তারা, তারই উপর নির্ভর করে আন্দাজে এই মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে আমাদের নিয়ে চ'লেছেন। প্রধান দলকে (main body) ঠিক মাঝখানে রেখে, ফ্ল্যাঙ্ক, রিয়ার ও অ্যাড্‌ভানস্‌ গার্ড ক্রমেই এগিয়ে চ'লেছে। আমাদের সন্দেহ হ'তে লাগলো—রাস্তা শেষ হয় না কেন? যেখানে পৌঁছবার কথা—কোথায় সে স্থান? রাত্রি প্রায় নটার সময় সবারই ওয়াটার বটলের জল ফুরিয়ে গেছে—যুবকেরা সব "জল, জল" বলে চীৎকার সুরু করলে, সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত মার্চ ক'রেও আমাদের গন্তব্য স্থানের কোনও কিনারা পেলাম না। ধূলো-বালিতে সমস্ত শরীর ঢেকে ফেলেছে—সকলের মুখের ভিতরটা আঠার মত হয়ে গেছে—ঘোড়া ও খচ্চরের জিভ্‌ আধ হাত বেরিয়ে এসেছে। যখন বুঝতে পারলাম রাস্তা হারিয়েছি তখন আমরা এতক্ষণ যে কষ্ট সহ্য করেছিলাম—তা যেন হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠল—কিন্তু তবুও চলেছি। রাত যখন প্রায় দেড়টা তখন কম্যাণ্ডিং অফিসার কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রামের আদেশ দিলেন। এই আদেশ পাওয়া মাত্র আমরা হলট্‌ করলাম। হলট্‌ করলাম বটে কিন্তু একটি ফোঁটা জলের জন্য সকলেই অস্থির হ'য়ে উঠল। আমাদের জলের পাত্রগুলি খচ্চরের পিঠে বোঝাই ছিল কিন্তু কম্যাণ্ডিং
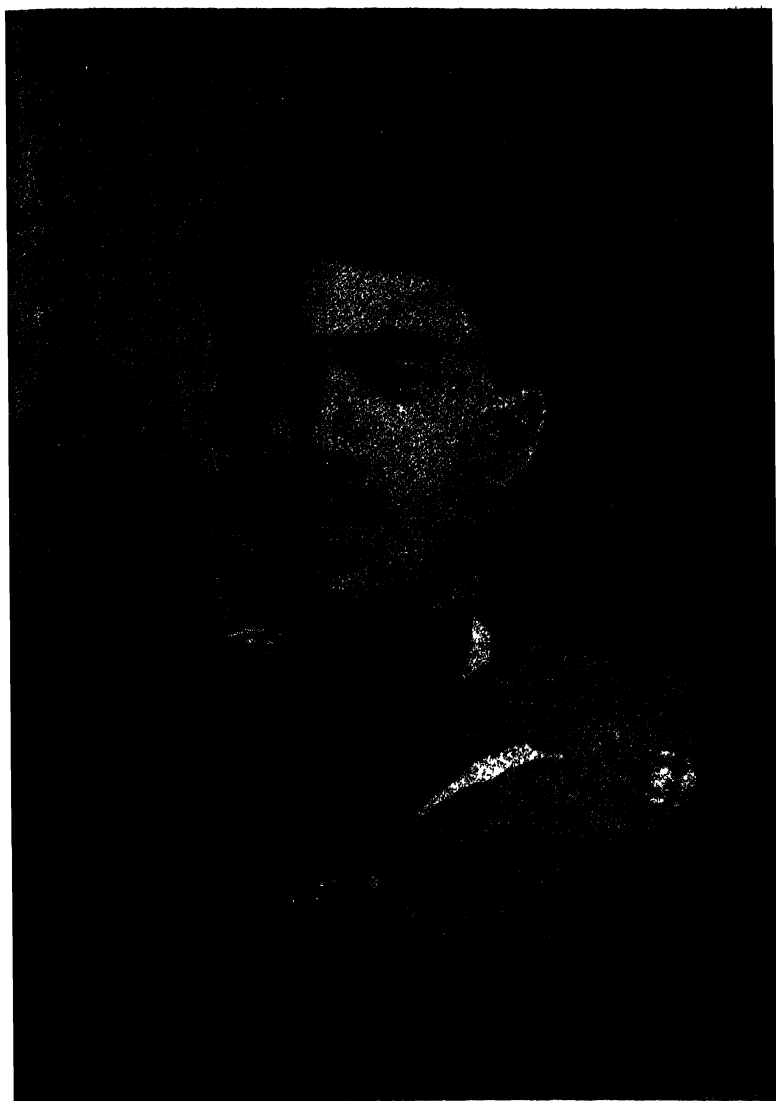
জমাদার প্রকৃতিকুমার ঘোষ।

অফিসার কিছুতেই প্রথমে জল দিতে রাজী হলেন না। কারণ মরু-ভূমির এই অজানা পথে ঐ জলই আমাদের ছিল একমাত্র সম্বল। অনেক অনুরোধের পর মাত্র একটি জলের পাত্র আমাদের দেওয়া হ'ল। এই জল প্রত্যেকের ভাগে পড়ল আধ মগ ক'রে। জল দেবার সময় যে জল মাটিতে পড়েছিল সেই ভেজা মাটিই হাতে তুলে কেউ কেউ চুষ্‌তে লাগল। কম্যাণ্ডিং অফিসার এবং অপর আর একজন ঘোড়ায় চ'ড়ে আমাদের লক্ষ্যস্থানের সন্ধানে বেরুলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা ফিরে এসে খবর দিলেন যে আরো দুই মাইল গেলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমরা পেঁাছতে পারব। এই শুনে আমরা উৎসাহের সঙ্গে আবার চ'লতে লাগলাম। এই-ভাবে রাত প্রায় ২½টার সময় আমরা লেসারজব নামক স্থানে পেঁাছলাম। "লেসার" বিশেষণ থাকা সত্ত্বেও মনে করেছিলাম স্থানটি বড়ই হবে—কিন্তু সে ধারণা সেখানে গিয়ে ঘুচে গেল। প্রথমে একটি ছোট পাহাড়ি নদী দেখ্‌তে পেলাম। জীবনে ছোট বড় নদী অনেকই দেখছি—কিন্তু সেইদিন এই ছোট্ট নদীটি আমাদের কি পরিমাণ আনন্দ দিয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যাক্, সেখানে হলট্ করে প্রথমে কড়া পাহারা নিযুক্ত করে তাঁবু খাটানো হ'ল। তারপর আমাদের মেডিকেল অফিসার জোশী সাহেব নদীর ধারে তিনটি ফ্ল্যাগ ও জল রাখার একটি ক্যানভাসের ট্যাঙ্ক খাড়া করলেন। এই তিনটি ফ্ল্যাগ খাড়া করার উদ্দেশ্য—নদীর জলকে তিনভাগে ভাগ করা। স্রোতের প্রথম অংশের জলে খাওয়া ও রান্না—দ্বিতীয় অংশের জলে

সৈনিকদের স্নান তৃতীয় অংশের জল ঘোড়া ও খচ্চরের স্নান ও অন্যান্য কাজ। খাওয়া ও রান্নার জল ঐ ক্যানভাসের ট্যাঙ্কে ভর্ত্তি করে জলে ক্লোরিন দিয়ে ব্যবহারের উপযুক্ত করা হ'ল। জলের এইরূপ কড়াকড়ি ব্যবস্থার কারণ—পাছে শত্রুরা জলের সঙ্গে বিষাক্ত পদার্থ মিশিয়ে দেয়। এইখানে সাময়িক বিশ্রামের পর আবার দীর্ঘ পথ চলা। মেডিক্যাল অফিসার দেখলেন যে কয়েকজনের পায়ের নীচে ভীষণ ফোস্কা (blister) হ'য়েছে। উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। আমাদের সঙ্গে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স গাড়ি ছিল না। স্থির হ'ল এদের এইস্থানে রেখেই আমাদের যেতে হবে। এ ছাড়া তখন আর কোনও উপায় ছিল না। একটি তাঁবু ও কিছু খাবার দিয়ে এদের ফেলে আমরা মার্চ ক'রে চ'লেছি। মাথার উপর সূর্য্য, পায়ের নীচের মাটি তেতে উঠেছে, কথায়ই বলে সূর্য্যের তাপ সহ্য হয় কিন্তু তার তাপে তপ্ত বালি সহ্য হয় না! সঙ্গে সঙ্গে সেই তপ্ত বালির ঝড় উঠে সকলকে যেন চাবকাচ্ছে। তার উপর—গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং! প্রত্যেক সৈনিকের দেহে আবার প্রায় একমণের উপর বোঝা! বোঝার মধ্যে খুব উপাদেয় জিনিস ছিল না—ছিল বুট, পট্টি, মোজা, খাকি প্যাণ্ট, কোট, শার্ট, টুপি, হ্যাভারস্যাক্, মগ, ট্রেঞ্চ খুঁড়বার কোদালী, বেয়নেট্, চামড়ার বেল্ট, রাইফল এবং একশত কুড়ি কার্ত্তুজ সহ ব্যাণ্ডোলিয়ার ইত্যাদি। এই অবস্থায় বাঙালী সৈনিকেরা মার্চ করে চলেছে। কারো মুখে একটি অভিযোগ নেই। সবাই নীরবে আদেশ পালন করে চলেছে।

চ'লেছি—পথের কোন সীমা নেই। সূর্য্য পাটে ব'সেছেন। ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো—তারপর অন্ধকারে মিশে গেলাম। কোনও সাড়াশব্দ নেই—শুধু বুটের শব্দ কানে আস্‌ছে। এমন সময় হঠাৎ হুইসিল্ বেজে উঠলো—অমনি রাস্তার দুইধারে দশ মিনিটের বিশ্রামের জন্য ইতস্ততঃ শুয়ে পড়া গেল—জেগে রইল মাত্র কয়েকজন সেনট্রী। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কেহ কেহ ঘুমে অচেতন—আবার কেহ বা স্বপ্নে বিভোর। ১০ মিনিট পরে আবার হুইসিল্ বাজা মাত্রই সকলেই যন্ত্রবৎ মার্চ সুরু করলাম। এইভাবে প্রায় রাত ৮টার সময় আমরা উথ্‌মানিয়া নামক স্থানে পৌঁছিলাম। বেইজী থেকে রওনা হবার সময় উপযুক্ত রসদ সঙ্গে আনা যায় নাই। রসদ উপযুক্ত পরিমাণে আনবার জন্য কয়েকজন সৈনিককে বেইজীতে রেখে আসা হয়েছিল। কথা ছিল দুইদিন পরে লরীযোগে তারা এসে উথ্‌মানিয়াতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। উথ্‌মানিয়াতে পৌঁছে দেখি, তাদের পৌঁছে দিয়ে লরী ফিরে গেছে। উথ্‌মানিয়া ও বেইজীর মধ্যে একটী টেলিফোন লাইন ছিল। আমাদের সিগ্‌ন্যালার সেই লাইনের সঙ্গে টেলিফোন লাগিয়ে বেইজীতে খবর দিল যে, লেসারজবে যে কয়জনকে আমরা রেখে এসেছিলাম তাদের যেন নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করা হয়। যাক্ সেখানে রাতটা বিশ্রাম ক'রে ভোর ৪টার সময় উথ্‌মানিয়া থেকে আবার মার্চ সুরু হলো। পথ চলেছি—বেলা ১০টা বাজল—১১টা বাজল—এইভাবে চ'লতে চ'লতে বেলা ১২টার সময়—

বহু দূরে একটি নদী দেখ্‌তে পেলাম। আর অমনি কোথা থেকে যেন দেহে দ্বিগুণ শক্তি এলো। গতি হঠাৎ দ্রুত হল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে নদীর তীরে এসে পড়লাম। কম্যাণ্ডিং অফিসারের অনুমতি পেয়ে, দেহের বোঝা মাটিতে নামিয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর মধ্যে। এইখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার বিকেল ৪টার সময় মার্চ সুরু হল। শুন্‌লাম এবার আমাদের গন্তব্য স্থান হচ্ছে বেরিয়ান ব্রিজ। উথ্‌মানিয়া ও বেরিয়ান ব্রিজের মধ্যস্থিত একটা ঘাঁটিতে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার মার্চ সুরু করে পরের দিন বেলা ১০টার সময় বেরিয়ান ব্রিজে পৌঁছিলাম। পথে ভেবেছিলাম সেখানে জলের কষ্ট ভোগ করতে হবেনা। কারণ ব্রিজের দিকেই ত এগিয়ে চলেছি। ব্রিজের নিকট গিয়ে হতাশ হ'তে হ'লো। ছোট একটি নালা, তার উপর কয়েকখানা মোটা কাঠ পাতা র'য়েছে। নালাটি নোংরা জলে ভর্ত্তি। যাক্ এই অপূর্ব্ব ব্রিজ পার হ'য়ে কিছুদূর যাবার পর দেখা গেল একটি ছোট সামরিক আউট্‌পোষ্ট। সেদিন সেখানে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত বিশ্রাম করে আবার চ'লতে লাগ্‌লাম। আমাদের এখনকার গন্তব্যস্থানের নাম "কির্কুক"। সারারাত মার্চ করে পরদিন সকালের দিকে দূরে কির্কুক সহর দেখা গেল। এইবার সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে চলা সুরু ক'রলে। ১২ দিনের পর কির্কুক কেল্লাতে এসে পড়লাম। কেল্লাটি পূর্ব্বে তুর্কীদের অধীনে ছিল। কেল্লার ভিতরে বাঙালী সৈনিকদের থাকার বন্দোবস্ত হ'ল। "লেসারজব"

নামক স্থানে যে কয়জন সৈনিককে আমরা ফেলে এসেছিলাম—তারা পরবর্ত্তী একটি ফোর্ডভ্যানএর দলের সঙ্গে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। এইখানে হ'ল আমাদের দু'দিনের বিশ্রাম। এই সুদীর্ঘ মার্চ আমরা যেভাবে সমাধা করেছি —যে পরিমাণ কষ্ট আমাদের এতে সহ্য করতে হয়েছে— পাঠককে আর ততখানি কষ্ট দিলাম না। মার্চ পর্ব্বটা সংক্ষেপই বর্ণনা করলাম। একদিন কম্যাণ্ডিং অফিসারের অনুমতিপত্র নিয়ে প্রকৃতি ও আমি নদীর অপর পারে সহর দেখ্‌তে গেলাম। সহরের চারিদিকে ব্রিটিশ প্রহরীরা কড়া পাহারা দিচ্ছে। সহরের একটি গেটে সেই অনুমতি পত্র প্রহরীকে দেখিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রলাম। প্রথমে বাজারের ভিতরে গিয়ে দেখি সেখানে নানা দেশের তৈরী নানাপ্রকার রিভলবার, বন্দুক, ছোরা ইত্যাদি বিক্রির জন্য দোকানে সাজিয়ে রেখেছে। বাজার থেকে বেরিয়ে আমরা সহরের নানা জায়গা ঘুরে কেল্লায় ফিরে এলাম।

কিকুর্ক "কুর্দিস্থান এক্সপিডীশনারি" ফোর্সের হেড কোয়ার্টার। এই ফোর্সের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ছিলেন জেনারেল ফ্রেজার। এখানে কয়েক দল ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্য আছে। ব্রিটিশরা যখন কিকুর্ক অধিকার করে, তখন জার্মান জেনারেলের অধীনে তুর্কী সৈন্যেরা পরাজিত হ'য়ে কিকুর্ক ছেড়ে পালিয়ে যাবার সময় এখানকার অধিবাসীদের উপর ভীষণ অত্যাচার ক'রেছিল। এমন কি জার্মান জেনারেলের হুকুমে প্রত্যেক যুবতীর দেহে

একপ্রকার মারাত্মক রোগের বীজাণু ইনজেক্শন্ ক'রে দিয়ে যায়। স্বচক্ষে দেখেছি সেই সুন্দরী মেয়েদের মুখে ও হাতের স্থানে স্থানে ঐ মারাত্মক ইনজেক্শনের ফলে বিশ্রী দাগ হয়ে গেছে।

কিকুর্কে কুর্দি, পারসিয়ান, আরবী, আরমেনিয়ান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতের লোক দেখ্লাম। "বেইজী" থেকে কিকুর্ক পর্য্যন্ত মরুভূমি পার হয়ে এসেছি, কিন্তু এবার থেকে আমাদের চলতে হবে পাহাড়ের উপর দিয়ে। পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা এঁকে বেঁকে গিয়েছে। কুর্দিস্থানটি সমস্তই পাহাড়—পাহাড়গুলি নেড়া—গাছ্ খুব কমই—পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ছোট ছোট নদী ও ঝর্ণা বয়ে গেছে। আবার মাঝে মাঝে চাষবাসের উপযোগী জমিও আছে। এক একজন নেতার অধীনে কতকগুলি গ্রাম থাকে। কুর্দিরা কারো অধীন নয়, নিজেদের আইনেই চলে—নিজেদের মধ্যেই লড়াই করে—আবার শান্ত হয়। নিজের দেশ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের তোয়াক্কা এরা করে না। মেয়ে পুরুষ সকলেই ঘোড়ায় চড়ে এবং বন্দুক চালায়। এরা দেখতে লম্বা-চওড়া—ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির। এদের প্রধান কাজই লুঠ-তরাজ করা। এদের হাতে একবার পড়লে আর নিস্তার নেই—নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করে। এদের যুদ্ধের ধরণও সাংঘাতিক। গোপনে দলবদ্ধ হয়ে অতর্কিতে এরা আক্রমণ করে। আমাদের বিশ্রামের দুইদিন কাটিয়ে আবার মার্চ সুরু হলো পাহাড়ের চড়াই পথ দিয়ে। কুর্দিদের বিদ্রোহ চ'লছে—এই হিংস্রমানুষের সম্মুখে চলছি আমরা। কিকুর্ক থেকে রওনা হ'বার সময় ১৪।১৫ জন

সৈনিকদের পায়ের নীচে ফোস্কা হওয়ার দরুণ হাবিলদার মেজর নগেন ঘোষের অধীনে এদের কেল্লাতে রেখে যেতে হয়েছিল। সেখানে দুইএকদিন বিশ্রামের পর নগেন তার দল নিয়ে Camel Caravan Guard করে Ration নিয়ে বেজিয়ান পাসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হ'ল।

কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রিটিশ ও ভারতীয় অফিসারদের নিকট তাঁর কার্য্যধারা পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দেবার পর সকালবেলা আমরা পাহাড়ের রাস্তা ধরে মার্চ সুরু করলাম, প্রধান দলকে মাঝে রেখে। বেলা যত বাড়তে লাগলো পাহাড় ততই গরম হতে লাগলো। খাড়া পথ—আস্ত আস্তে উঠ্‌তে হচ্ছে। খচ্চরের পিঠ থেকে জিনিসপত্র মাঝে মাঝে পিছনের দিকে স'রে আসছে—ট্রান্সপোর্ট সেক্‌শন্ হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছে—দৌড়ে গিয়ে জিনিষগুলি ঠিক ভাবে বসিয়ে দিচ্ছে।

এই ভাবে "করানজিল" নামক স্থানে এসে পৌঁছিলাম। করানজিলের নিকটবর্ত্তী করানজিল গর্জের মধ্যে কুর্দিবিদ্রোহের প্রথম দিকে এক বড় কনভয় (Convoy) কুর্দিদের হাতে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। কেবলমাত্র একজন অশ্বারোহী সৈনিক প্রাণ নিয়ে ফিরে করানজিলের সৈন্যদের ঘাঁটিতে খবর দিতে পেরেছিল। তারা তৎক্ষণাৎ সাবধান হয় এবং অসীম সাহসের সঙ্গে তিন দিন ধরে শত্রুদের বিপক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে আত্মরক্ষা করে। ইহার পরে একদিন সকালে কির্কুক থেকে একজন বড় অফিসার করানজিলের দিকে আসার সময় অবরুদ্ধ দলের হেলিওগ্রাফ্

সৈনিক বাঙালী
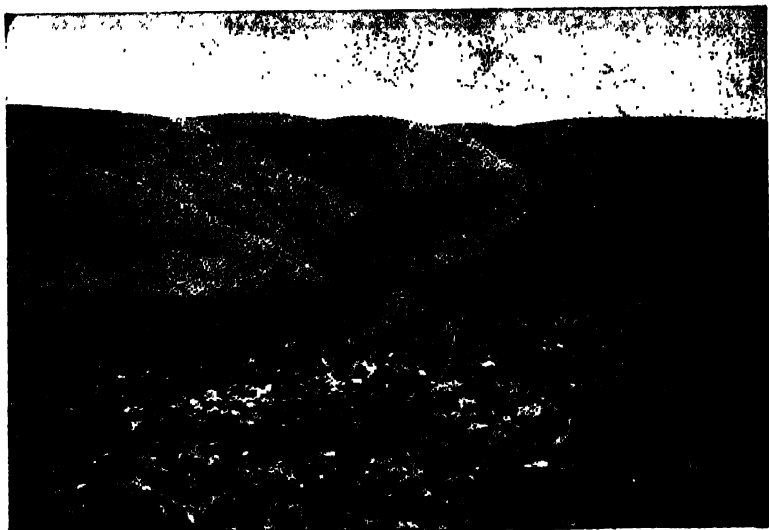
করানজিল গর্জ কুর্দিস্থান

× চিহ্নিত গর্জের মধ্যদিয়া বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট অগ্রসর হইতেছে।

সিগ্ন্যাল দূর থেকে দেখে তাদের অবস্থা জান্‌তে পেরে—সেই মুহূর্ত্তে কিকুর্‌কে ফিরে গিয়ে চারিদিকে খবর দিয়ে, সৈন্য সংগ্রহ ক'রে করানজিলের দিকে রওনা হ'য়ে শত্রুদের পশ্চাৎদিক্ হতে আক্রমণ করেন। শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। সেদিন তারা সাহায্য না করলে করানজিলের ঘাঁটির সমস্ত সৈন্য নির্ম্মূল হয়ে যেত; কারণ তিনদিন ধরে যুদ্ধ করে তাদের সমস্ত গুলি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল—এবং শেষ পর্য্যন্ত তারা একটী মাত্র মেসিনগান্ চালাচ্ছিল। পরে সেখানকার গ্যারিসানের কম্যাণ্ডিং অফিসার M. C. (Military Corss) পদকে পুরষ্কৃত হন। করানজিল থেকে "করানজিল গজ", "চেমচেমাল্", "দরবন্দ-ই-বেজিয়ান পাস্" অতিক্রম ক'রে "তাশলুজায়" পোঁছান গেল। এই সকল গর্জ ও পাস্ অতি ভয়ঙ্কর স্থান। এই সকল স্থানই কুর্দিরা অতর্কিত আক্রমণে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সৈন্যদলের বহু সৈন্যকে হত্যা করে। গর্জ ও পাসের স্থানে স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী সৈন্য-দলের সাঁজোয়া গাড়ী (আরমার্ড কার) ফোর্ডভ্যান এবং মৃতদেহ ইত্যাদি ভাঙা ও পোড়া অবস্থায় ইতস্ততঃ পড়ে র'য়েছে। এই স্থানগুলি দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে চারিদিকে নজর রেখে চ'ল্‌তে হচ্ছে এবং পথে যে কোন কুর্দিকে দেখ্‌লে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে যা'তে সে শত্রুপক্ষকে কোনও সংবাদ পোঁছে দিতে না পারে। আমাদের কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল স্যাণ্ডিফোর্ডএর নামে একটি কলাম্ নিম্নলিখিত ইউনিট্ দিয়ে গঠিত হয়।—

১। ফর্টিনাইন্‌থ বেঙ্গলীজদের একটি কম্পানি—তার

সঙ্গে ৪টী লুইস্ গান সেক্শন্, সিগনালিং এবং ট্রান্সপোর্ট সেক্শন্।

২। এইট্টি ফিফ্‌থ বর্মনদের একটি সেক্শন্।

৩। দুটো মাউণ্টেন ব্যাটারি সেক্শন্।

৪। মেডিকেল সেক্শন্।

৫। সার্ভে সেক্শন্।

৬। বেতার সেক্শন্।

৭। পলিটিক্যাল অফিসার, ইণ্টারপ্রেটার (দোভাষী) এবং ইনফর্মার। এইখান থেকেই শত্রুদের উপর আক্রমণ স্বরু হয়। আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে, পরস্পর দলের সংযোগ রেখে পাহাড়ের পাশ দিয়ে কুর্দিদের অনুসরণ করে, তাড়া করতে লাগ্‌লাম। কিন্তু তারা সেই পার্ব্বত্য অঞ্চলের চোরা পথ দিয়ে এমন ভাবে পালাতে স্বরু ক'রলে যে আমরা আর তাদের সম্মুখে যাবার স্বযোগ বা স্ববিধা পেলাম না। এইভাবে কুর্দিদের সঙ্গে লুকোচুরি ক'রে আমরা ক্রমেই এগিয়ে চল্‌লাম। এই উত্তেজিত অবস্থায়—মাইলের পর মাইল সেই দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে আমরা যখন "ইয়ালানকুশ" নামক স্থানে এসে পৌঁছলাম—সেইস্থানে সেই সময় আমাদের ইনফর্মার সংবাদ দিলে যে নিকটেই ৫০০ শত কুর্দি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এইখানে প্রধান সেনাদলের ক্যাম্প করা হ'ল এবং তৎক্ষণাৎ কম্যাণ্ডিং অফিসার আমাদের কার্য্যধারা নির্দ্ধারণ করলেন। "এ", "বি", "সি" ও "ডি", প্ল্যাটুনের কয়েকজন সেপাই ক্যাম্প রক্ষা ক'রতে লাগল।

বাদবাকী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ব্রিটিশ ও ভারতীয় অফিসারদের অধীনে বিভিন্ন দিক থেকে ঐ ৫০০ কুর্দিকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'ল। সাম্‌নেই পাহাড়—পাহাড়ের পিছন দিকে কুর্দিরা অপেক্ষা করছে। আক্রমণের হুকুম পাওয়া মাত্র, লুইসগান সঙ্গে নিয়ে একদল বাঙালী, বর্ম্মনদের একটি সেক্‌শন্‌ এবং একটি মাউণ্টেন ব্যাটারি সেক্‌শন্‌ পাহাড়ের উপর উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আর অন্য সব দল পাহাড়ের আশপাশ দিয়ে ঐ ৫০০ কুর্দিকে আক্রমণ ক'রতে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য, কুর্দিরা এই আক্রমণের প্রতিরোধ করলে না—সকলেই পালিয়ে গেল। সম্মুখ যুদ্ধ করে, শত্রুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে, সে সুযোগ পাওয়া গেল না। এর একটা কারণ ছিল—গুর্খা সৈন্যদের সাধারণতঃ ইণ্ডিয়ান হাইল্যাণ্ডারস্‌ (Indian Highlanders) বলে। এই কুর্দিরা গুর্খাদের ভীষণ ভয় করত।

পাহাড়ের উপরে গুর্খা সৈন্যদের যুদ্ধকৌশল পূর্ব্বে অনেকবারই এরা দেখেছে এবং এদের কাছে কুর্দিদের পরাজিতও হ'তে হ'য়েছে। সেইজন্য সবসময়ই কুর্দিরা গুর্খাদের এড়িয়ে চল্‌ত। কুর্দিরা বাঙালী সৈন্যদের গুর্খা সৈন্য ব'লে ভুল ক'রেছিল—কারণ অধিকাংশ বাঙালী সৈনিককেই গুর্খাদের মতই দেখাত দূর থেকে, তা'ছাড়া দ্রুত এগিয়ে যাওয়া, পাহাড়ে চড়াই উৎরাই অতিক্রম করা এবং সাহস ও ক্ষিপ্রতায় বাঙালী সৈনিকরা সেদিন কুর্দিস্থানে প্রকৃত গুর্খাদের মতনই পরিচয় দিয়েছিল। যা'হোক আমরাও শত্রুদের পিছনে মাইলের পর
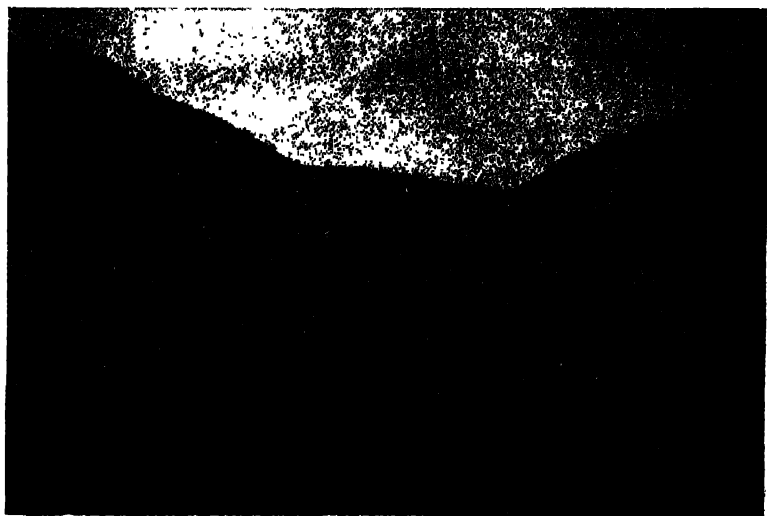
দরবন্ধ-ই বেজিয়ান পাস্—কুর্দিস্থান

× চিহ্নিত 'পাস' দিয়া বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট মার্চ করিয়া আসিতেছে।

মাইল তাড়া ক'রতে ক'রতে এসে প'ড়লাম একটি গ্রামে। গ্রামখানি ঠিক একটি পাহাড়ের নীচে অবস্থিত। গ্রাম দেখে মনে হ'ল সেখানে প্রায় তিন চারি শত লোকের বাস। যখন গ্রামের নিকটে এসেছি—তখন দেখি গ্রামের সব বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আমাদের সাম্‌নে সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়িয়ে দুইহাত তুলে জানাচ্ছে যে তারা আমাদের অধীনতা স্বীকার ক'রেছে। গ্রামের ভিতরে গিয়ে দেখি শক্ত-সমর্থ যত স্ত্রী ও পুরুষ এমন কি ১০ বছরের উপরের কোনও বালক বালিকা পর্য্যন্ত নেই—সকলেই আমাদের পৌঁছিবার আগেই ঘোড়ায় চ'ড়ে পালিয়ে গেছে। সেই গ্রামের বন্দুক, কার্ট্রিজসহ বেল্ট এবং ছোরা যা' পাওয়া গেল, সব হস্তগত করা গেল।

ইতিমধ্যে কর্ণেল 'বডি'র কলামও পারস্য সীমান্ত হ'তে এসে পৌঁছিলো। এরাও খবর পেয়েছিল যে শত্রুরা এইদিকেই আছে।

আমরা যখন কুর্দিস্থান এক্সপিডীশনারি ফোর্সে ছিলাম—সেই সময় অনেকগুলি কলাম্ কুর্দিদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল—তার মধ্যে ঃ—

১। কর্ণেল স্যাণ্ডিফোর্ড কলাম্

২। " বডি "

৩। " বেইলি " ইত্যাদি

এই সকল কলাম্ কিকুর্ক, পারস্য সীমান্ত এবং সুলেমানিয়া প্রভৃতি স্থান হতে কুর্দিস্থানে রওনা হয়।
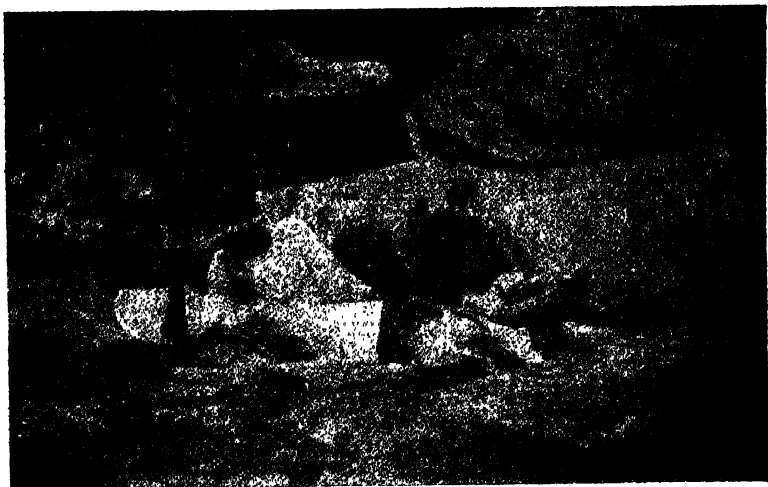
কুর্দ্দিস্থানে ডুমুরগাছের তলায় বিশ্রামের দৃশ্য

১। সুবেদার মনবাহাদুর সিংহ।

২। সুবেদার প্রমথ সাঁতরা।

৩। সুবেদার দুর্গাপদ ব্যানার্জ্জি।

৪। সাব এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জেন জোশী।

এই দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে প্রত্যেক কলামের পরস্পর সংযোগ এবং খবরাখবর রাখবার জন্য এয়ারোপ্লেনের ব্যবস্থা ছিল। যা'হোক সেই রাতে 'স্যাণ্ডিফোর্ড' এবং 'বডি'র কলাম্ এই গ্রামের কাছে ক্যাম্প ক'রলে। ক্যাম্পের চারিধারে এবং দূরে পাহাড়ের উপরে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করা হ'ল যা'তে কুর্দিরা অতর্কিতে আক্রমণ ক'রতে না পারে। আমার টেণ্ট্ পড়েছিল ঠিক বেতার সেক্শন্ তাঁবুর নিকটে। বেতারের সেই "চ্যাঁ, চ্যাঁ," শব্দে সারারাত ভাল ঘুম হল না। বেতার সেক্শন্ তখন কিরকুক, সুলেমানিয়া প্রভৃতি স্থানে সংবাদ আদান প্রদান করতে ব্যস্ত ছিল। পরদিন স্যাণ্ডিফোর্ড ও বডির কলাম্ পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন দিকে রওনা হ'ল। আমি আমার প্ল্যাটুন্ সহ গ্রাম থেকে ধৃত বন্দুক ইত্যাদি যাবতীয় জিনিব নিয়ে তাশ্লুজায় ফিরে এলাম। কলামের অবশিষ্টাংশ "কালাবাস" নামক স্থানের দিকে রওনা হল। সেইখান থেকে এরা পুনরায় বিভক্ত হ'য়ে, বিভিন্ন পথে রওনা হ'ল শত্রুর সন্ধানে। কালাবাস থেকে "বি" এবং "ডি" কম্পানির সেক্শন্ সমস্ত ব্রিটিশ অফিসার, সার্ভে সেক্শন্, বেতার সেক্শন্, ৮৫ সংখ্যক বর্ম্মণদের সেক্শন্ ও একটি মাউনণ্টেন ব্যাটারির কামান সহ কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল স্যাণ্ডিফোর্ড একদিকে চলে গেলেন এবং "এ" কম্পানির সেক্শন্ ও সুবেদার ফণি দত্ত এবং একটী কামান সহিত জমাদার প্রকৃতি ঘোষ ইয়ালানকুশের দিকে ফিরে এলো। সেই মারাত্মক শত্রুপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ছোট ছোট

দলে বিভক্ত হতে যাওয়া বিপজ্জনক ব্যাপার—কিন্তু বাঙালী সৈনিকদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের এতখানি বিশ্বাস এবং ভরসা ছিল যে ছোট দল দেখেও অন্ততঃ যদি শত্রুগণ প্রলুব্ধ হয়ে এগিয়ে আসে, তা'হলেও এদের কাছে কুর্দিরা হার মানতে বাধ্য হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে আশা পূর্ণ হল না। শত্রু দেখা দিল আর এক রূপে। সেই সময়কার ভুক্তভোগী 'এ'-কম্পানির বিবরণ থেকে জানা যায় তারা ফেরবার পথে কি ভীষণ দুর্য্যোগেই না ভোগ ক'রেছে। তারা যখন "ইয়ালানকুশের" দিকে ফিরছিল —সেই সময় শত্রু দেখা দিল ঝড়ের বেশে। বিষম ঝড় এবং বৃষ্টি— তারই মধ্যে উন্মুক্ত প্রান্তরে তারা চলেছে! এইভাবে তারা যখন সর্ব্বাঙ্গ ভিজে শীতে কাঁপ্তে কাঁপ্তে অনাহারে ইয়ালানকুশে এসে পৌঁছল—তখন শুন্তে পেলে বিদ্রোহীগণ গত রাত্রে সেইখানেই এসেছিল।

ঝড় থামল না—সমানে ব'য়ে চ'লেছে এবং বৃষ্টিরও বিরাম নেই। সঙ্গে তাঁবু একটির বেশী নেই। যা আছে তাও খাটানো যায় না— দড়ি ছিঁড়ে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এত দুর্দ্দশা সহ্য করে তারা পরদিন তাশ্‌লুজাতে এসে পৌঁছল। কিন্তু তখনও আমাদের সঙ্গে বিদ্রোহীরা লুকোচুরি খেল্‌ছে। সংবাদ পাওয়া গেল "মামলাহাসাই" নামক স্থানে শেখ মহম্মদ তার দলবল নিয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ আমরা মাম্‌লাহাসাইএর দিকে রওনা হলাম। পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম ক'রে চলেছি। দেখ্‌তে পেলাম দূরে একটি খাড়া পাহাড়ের উপর ধোঁয়া উঠ্‌ছে। কুর্দিদের

চর বা স্পাই সকল সময় আমাদের চলাফেরার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌ত'। তাদের অদ্ভুত রকমের সঙ্কেত চিহ্ন ছিল—পাহাড়ের উপর শুক্‌নো ঘাসে আগুন লাগিয়ে দিয়ে নিজেদের দলকে শত্রুদের আগমন জানিয়ে দিত। আমরা অতিকষ্টে সেই খাড়া পাহাড়ে উঠে দেখি সেখানে একটি গ্রাম। গ্রামটিতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ছাড়া কাউকে দেখা গেল না। আমাদের দেখে এরাও কেউ কেউ হাত তুলে, আবার কেউ কেউ নিশান ধ'রে আমাদের বশ্যতা স্বীকার ক'রছে। গ্রামে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, আবার মাম্‌লাহাসাইএর দিকে রওনা হলাম। রাস্তায় কয়েকজন কুর্দিকে বন্দুক সমেত গ্রেপ্তার করা হল—তারা সম্ভবতঃ কোনও রকমে দলছাড়া হয়ে পড়েছিল। মাম্‌লাহাসাইএর কাছাকাছি যখন এসে পৌঁছেছি তখন দেখলাম সাম্‌নেই একটি নদী। নদী পার হ'তেই হবে, কিন্তু জল বুক পর্য্যন্ত। সকলেই নদী পার হলাম বন্দুক উঁচু করে। মাম্‌লাহাসাইতে পৌঁছে দেখি বেইলির কলাম্‌ আগে থেকেই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের মুখে শুন্‌লাম্‌—সেখ মহম্মদ তার দল নিয়ে এখানেই ছিল, গতরাতে পালিয়ে গেছে। মাম্‌লাহাসাই দেখে মনে হ'ল গ্রামটি সমৃদ্ধিশালী—এখানে একটি বড় লবণের কারখানা আছে। শুনলাম এইখান থেকে সমস্ত কুর্দিস্থানে লবণ সাপ্লাই করা হয়। রাত্রিটা সেখানে কাটিয়ে পরদিন চেম্‌চেমালের দিকে ফিরে চল্‌লাম।

আমাদের স্থানে অপর একটি দল এল। আমরা কিকুর্কে ফিরে গেলাম। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে দিন পাঁচেকের

বাঙালী সৈনিক বেষ্টিত কুর্দি বিদ্রোহী নেতা
সেথ মহম্মদ বন্দী অবস্থায়।

মধ্যে বিদ্রোহীরা সেই দলকে আক্রমণ ক'রে দলটিকে বিধ্বস্ত করলে। এইবার গেল একদল গুর্খা। এই গুর্খাসৈন্যদলই এই বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করে এবং বিদ্রোহী নেতা সেখ মহম্মদ সদলবলে এদের হাতে বন্দী হয়। তারপর এই দুর্দ্ধর্ষ বিদ্রোহী কুর্দি নেতা শেখ মহম্মদ, যে, সমস্ত কুর্দিস্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলেছিল, তাকে বন্দী অবস্থায় বস্‌রা পর্য্যন্ত বাঙালী সৈনিকেরাই নিয়ে এসেছিল। এই বিদ্রোহ দমন ব্যাপারে বাঙালী সৈনিকরা নিজেদের শক্তির পূর্ণ পরিচয় উপলব্ধি করতে পারে এবং "কুর্দিস্থান এক্সপিডীশনারি ফোর্সে'র" কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ জেনারেল ফ্রেজার ও অন্যান্য ব্রিটিশ অফিসারগণও এদের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবান হ'ন। কাজেই যুদ্ধ বিরতির পর এই কুর্দি-বিদ্রোহ বাঙালীর চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৭ম পর্ব্ব

কুর্দিস্থান এক্সপিডীশন থেকে মাস দুই পরে ফিরে এসে আবার তনুমাতে নিজেদের পল্টনের সঙ্গে এসে মেলা গেল। এখানে এসে দেখি আগের মতই সব কাজ চলছে। তবে কতকগুলো নতুন খবর এখানে পাওয়া গেল। শুনলাম প্রত্যেক কম্পানি থেকে দুএকজন ভারতীয় অফিসার ও ছ-সাত জন করে ছোট ছোট দলে বাঙালী সৈন্যদের দেশে ফিরে যাবার জন্যে ছুটির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমিও ছুটির দরখাস্ত করলাম। দেখলাম সুবেদার মেজর কুমার অধিক্রম মজুমদারও দীর্ঘ ছুটিতে দেশে যাচ্ছে। সুবেদার দুর্গাপদ ব্যানার্জি সুবেদার মেজর পদে কাজ করবে।

আরও একটি সুসংবাদ—বাঙালী রেজিমেণ্ট নাকি রাখবার চেষ্টা হচ্ছে। অতিরিক্ত চার বছরের জন্যে নতুন বণ্ড সই করে দিলেই যার ইচ্ছা সে আরও চার বছর সৈন্যপদে থাকতে পারবে। অনেক বাঙালী ছেলেই এতে রাজি হয়েছিল এবং বণ্ড সই করেছিল।

১৯২০ সালের মাঝামাঝি বেঙ্গলী রেজিমেণ্টকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

সুবেদার মেজর অধিক্রম মজুমদার ও আমি একদিন ভারতের দিকে রওনা হলাম। এবারে আমাদের যাত্রা বেশ আরামপ্রদই

হয়েছিল—বহুদিন পরে দেশে ফেরার আনন্দেই বোধ হয় সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যে একটি স্মৃতি মাঝে মাঝে জেগে উঠে মনকে বিষণ্ণ করে তুলত। সে হচ্ছে অরুণের স্মৃতি। মরুভূমির বুকে তাকে রেখে এসেছি অন্তিম-শয্যায় শুইয়ে। বিধাতা তার আত্মার কল্যাণ করুন।

জাহাজে মজুমদার 'অধীর হয়ে উঠেছে—দেশে পৌঁছবার জন্যে। তার কারণ দেশে ফিরেই নাকি আবার তাকে বিলেতে পাড়ি দিতে হবে। এর অমায়িক ব্যবহারের কথা আজীবন মনে থাকবে। বাঙালীদের মধ্যে তার মত লম্বাচওড়া চেহারা সাধারণত দেখা যায় না। দেখলেই মনে হত যেন সে একজন কুর্দি—শুধু তার ব্যবহারটি ছিল তাদের বিপরীত, সে ওকালতি ছেড়ে সৈনিক হতে গিয়েছিল।

যাবার দিন হাওড়া ষ্টেশনে মঙ্গল-ঘটের সামনে দাঁড়িয়ে যে জননীর আশীর্ব্বাদ আমরা লাভ করে ধন্য হয়েছিলাম তিনি এরই জননী।—বীরের জননী।

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে করাচি বন্দরে এসে পৌঁছলাম। কয়েকজন সৈনিক বন্ধু এসেছিল আমাদের ব্যারাকে নিয়ে যাবার জন্য। সেখানে গিয়ে দেখি অনেক কিছুই পরিবর্ত্তন হয়েছে। অনেকগুলো ব্যারাক রিক্রুটে ভর্ত্তি হয়ে গেছে—যে দিকে তাকাই সবই অচেনা মুখ।

আমাদের জন্য একটি আস্তানা ঠিক হ'ল। ভারতীয়

অ্যাডজুট্যাণ্ট আমার জন্য আর্দালি ঠিক ক'রে দিলে। এখানে আমাকে প্রায় এক সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল। ক'দিন করাচীতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বেশ আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া গেল। আমাদের সৈনিক কবি হাবিলদার কাজি নজরুল ইস্‌লামকে দেখতাম—অবসর সময় সৈনিকজীবনের সকল রকম ছন্দকে তিনি কাব্যছন্দে রূপান্তরিত করছেন।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের অবসানে মহামান্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ, যে সকল ভারতীয় রেজিমেণ্ট মেসোপটেমিয়া এবং ইউরোপের 'ওয়েস্টার্ণ ফ্রণ্টে' বা পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল—সেই সব রেজিমেণ্টের প্রত্যেকটি থেকে দু'একজন প্রতিনিধিকে লণ্ডনের 'পীস্ সেলিব্রেশন' বা শান্তি উৎসবে যোগ দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাঙালী রেজিমেণ্টও নিমন্ত্রিত হয়েছিল। বাঙালী রেজিমেণ্ট থেকে জমাদার রণদাপ্রসাদ সাহা এবং আমার 'সি' কম্পানি থেকে হাবিলদার মোহিতকুমার মুন্সী, সিপাহী নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিল। হাবিলদার মোহিত মুন্সী পীস সেলিব্রেশনে যোগদান উপলক্ষে যে ডায়েরি লিখেছিল তা থেকে কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত করছি :—

"১৯১৯ সালে জুন মাসে, আমি আমাদের রেজিমেণ্টাল হেড কোয়ার্টার করাচীতে ইন্‌ষ্ট্রাক্টরের পদে কার্য্য করিতেছিলাম। সেই সময় করাচি ডিপোতে বাঙালী রংরুটদের সামরিক শিক্ষা পুরা দমে চলিতেছিল। আমি, আমারা স্কুল অব্ ফিজিক্যাল ট্রেনিং এবং বেয়োনেট ফাইটিংএ শিক্ষা লাভ

করিয়া ইন্‌ষ্ট্রাক্টর পদে করাচী ডিপোতে রংরুটদের শিক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমারাতে আমরা প্রায় ৫০ জন বিভিন্ন রেজিমেণ্টের বৃটিশ ও ইণ্ডিয়ান অফিসার, এন-সি-ও, একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যোগদান করিয়াছিলাম। সেই পরীক্ষায় একজন বৃটিশ ক্যাপটেন প্রথম স্থান ও আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। উহাতে আমি ১০৲ টাকা পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছিলাম। এখানে ইহা উল্লেখের একমাত্র কারণ এই যে, সুযোগ পাইলে বাঙালী ছেলেও যে সৈনিকের কার্য্যে যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে, ইহাতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

জুন মাসের শেষের দিকে শুনিলাম লণ্ডনে পীস্ সেলিব্রেশনে ফর্টিনাইন্‌থ বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট হইতেও তিনজন প্রতিনিধিকে যাইতে হইবে। ২৫শে জুন তারিখে ডিপোর সমস্ত বাঙালী সৈনিকদের "Fall in" করাইয়া অর্থাৎ সৈনিকের রীতিতে দাঁড় করাইয়া ডিপোর কম্যাণ্ডিং অফিসার এবং ব্রিগেড ষ্টাফ অফিসারগণ সকলকে পরিদর্শন করিলেন। পরিদর্শন করিবার সময় কম্যাণ্ডিং অফিসার মেজর ড্যারেল আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Your Name ?" আমি উত্তর করিলাম—"M. K. Munshi, Sir." পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "Are you willing to go to the United Kingdom ?" আমি উত্তর দিলাম, "Yes, Sir." মেজর ড্যারেল বলিলেন, "Do you Know, why ? You will present arms to His Mejesty the King." আমি উত্তর দিলাম, "I shall take it as a particular privilege of my army life.."

রেজিমেণ্ট পরিদর্শন করিবার পর জানা গেল জমাদার রণদাপ্রসাদ সাহা, সেপাই নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য, এবং আমাকে ৭০০০ বাঙালী সৈনিকের প্রতিনিধি হইয়া লণ্ডনে পীস্ সেলিব্রেশনে যোগদানের নিমিত্ত যাইতে হইবে।
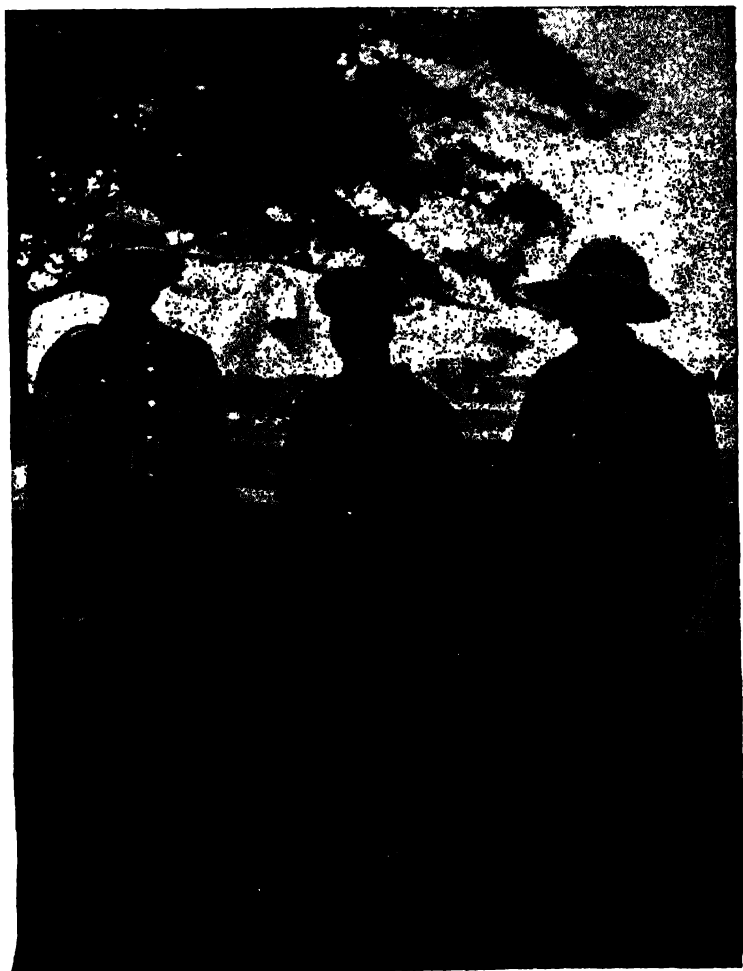
লণ্ডন পীস্ সেলিব্রেশনে বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের প্রতিনিধিগণ
হাবিলদার মোহিতকুমার মুন্সী, জমাদার রনদা সাহা,
সিপাহী নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য ।

আমাদের যথাযোগ্য বস্ত্রাদি ও অন্যান্য উপকরণে সুসজ্জিত করার ভার কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার কাজি নজরুল ইস্‌লামের উপর পড়িল। ২৭শে জুন ভারতের বিভিন্ন রেজিমেণ্ট হইতে প্রায় ২০০ শত সৈনিকসহ করাচীর জাহাজঘাটে উপস্থিত হইলাম। বেলা প্রায় ১২টার সময় আমাদের জাহাজ বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইল। ২৮শে জুন বেলা আন্দাজ দুই ঘটিকার সময় বম্বে পোর্টে প্রবেশ করিলাম এবং বৈকালের দিকে জাহাজ হইতে নামিয়া মেরীন লাইনে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেইদিন রাত্রে মেরীন লাইনের অর্ডারলি অফিসার প্রতি ব্যারাকে খবর দিয়া গেলেন, "আগামী কল্য প্রাতে ৮টার সময় ডকে উপস্থিত হইতে হইবে।" ডকে যাইয়া দেখি "এস্, এস্, বরোদা" জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে। ভারতবর্ষের বৃটিশ, ইণ্ডিয়ান এবং নেটিভ ষ্টেটের বিভিন্ন রেজিমেণ্টের প্রায় ৬০০ শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কাহাকেও চেনে না—অথচ সকলেই একই পথের যাত্রী।

বৃটিশ, অ্যাংলোইণ্ডিয়ান, শিখ, রাজপুত, বাঙালী, মাহারাট্টা, পাঠান, বেলুচী, গুর্খা, এবং ঘারোয়ালী প্রভৃতি সকলেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন সৈন্যদলের প্রতিনিধিরূপে, ভারত সম্রাটের অতিথিরূপে লণ্ডনে চলিয়াছে। জাহাজ ধীরে ধীরে সমুদ্রের বুকে ভাসিয়া চলিল। প্রায় ৬ দিনের দিন আমাদের জাহাজ বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় এডেন বন্দরে পৌছিল। জাহাজের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদিগকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখা গেল। এডেন বন্দর দেখার জন্য কাহাকেও জাহাজ হইতে নামিবার অনুমতি দেওয়া হইল না। কারণ ১৯১৯ সালের ১৯শে জুলাইয়ের পূর্ব্বে লণ্ডনে পৌছিতে হইবে। ঐ দিন লণ্ডন সহরে ভিক্টরি-মার্চ হইবার দিন স্থির হইয়াছে। উহাতে ব্রিটিশ এম্পায়ারের সমস্ত স্থান হইতে, যেমন ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা, ক্যানাডা ইত্যাদি এবং মিত্রপক্ষভুক্ত ফ্রান্স,

ইটালি এবং আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের সৈন্যদলের প্রতিনিধিরা একত্রে যোগদান করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা যাহাতে লণ্ডনে যথা সময়ে উপস্থিত হইতে পারে একমাত্র সেই কারণেই আমাদের এডেন বন্দরে নামিতে দেওয়া হইল না। এডেন বন্দর ছাড়িয়া ক্রমে আমরা লোহিত সাগরে পড়িলাম। আমাদের জাহাজে অপর একজন বাঙালীকে আমাদের সঙ্গীরূপে পাইয়াছি—তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল ব্যানার্জ্জি। তাঁহার পদবী হাবিলদার। জয়পুর রাজষ্টেটের প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি লণ্ডনে যাইতেছেন। এডেন হইতেও তিন চারজন প্রতিনিধি আমাদের সহিত মিলিত হইলেন।

জাহাজের উপর প্রত্যহ প্রাতে ৭টার সময় আধ ঘণ্টা করিয়া আমাদের সকলকেই ড্রিল করিতে হইত। আমাদের মধ্যে কয়েকজন ভিক্টোরিয়া ক্রস্-ধারীও ছিলেন। ভিক্টোরিয়া ক্রস বা সংক্ষেপে ভি-সি, ব্রিটিশ আর্মির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানজনক উপাধি। ইহা "Exceptional Act of Gallantry" বা বীরত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ স্বয়ং সম্রাট দান করিয়া থাকেন। লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া আমাদের জাহাজ সুয়েজ ক্যানেলের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। ক্যানেলের ধারে অসংখ্য ক্যাম্প দেখিলাম। তুর্কি হইতে বিতাড়িত আর্মেনিয়ানরা এই সব ক্যাম্পে বাস করিতেছিল। ক্যাম্পের আশে পাশে সুন্দর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খেলা করিতেছিল। অদৃষ্টের পরিহাস! এই আর্মেনিয়ানরা আজ গৃহহীন, এক মুঠো অন্নের সংস্থান নাই। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উদারতাতেই আজ ইহারা জীবন ধারণ করিতেছে। সুয়েজ ক্যানেল, ভূমধ্যসাগর প্রভৃতি পার হইয়া আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের বুকে চলিয়াছি। স্পেন ও পর্ত্তুগালের তীরভূমি ধরিয়া আমরা বিস্কে উপসাগরে আসিয়া পড়িলাম। বিস্কে উপসাগরে যখন পড়িলাম তখন রাত্রি প্রায় ১২টা

হইবে। এই সময় ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হইতে লাগিল। বিস্‌কে উপসাগর সর্ব্বদাই প্রায় ভয়ঙ্কর। আমাদের একজন বন্ধু ব্রিটিশ সারজেণ্ট অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন, এই সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়। আমরা সকলে সামরিক প্রথা অনুসারে তাঁহার মৃতদেহ বিসকে উপসাগরে সলিল সমাধি করিলাম।

ঝড় বৃষ্টির দরুণ আমাদের জাহাজ যথা সময়ে লণ্ডনে পৌছাইতে না পারাতে ১৯শে জুলাইয়ের ভিক্টরি-মার্চে ভারতীয় কনটিনজেণ্ট যোগদান করিতে পারে নাই—ইহাতে আমরা সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলাম। সাউদামটন ডকে নামিয়া হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেস গার্ডেন যেখানে আমাদের ক্যাম্প পড়িয়াছিল সেইস্থানে Special train যোগে বিকালে পৌছাইলাম।

২রা আগষ্ট (১৯১৯ সালের) লণ্ডন সহরে ভারতীয় কন্টিনজেণ্টএর ভিক্টরি-মার্চ হইবে। সেইজন্য কয়েকদিন হ্যাম্পটন কোর্টের রাস্তায় রুটমার্চ করিয়া রিহার্সাল দেওয়া হইল। সিপাই নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য এবং আমি ঘারোয়ালীদের সহিত সংলগ্ন ছিলাম। আমাদের খাওয়া দাওয়া তাহাদের সঙ্গেই হইত। জমাদার রণদাপ্রসাদ সাহা ভারতীয় অফিসারদের ক্যাম্পে থাকিতেন।

২রা আগষ্ট তারিখে হ্যাম্পটন কোর্ট হইতে বেলা দশটার সময় আমরা (সংখ্যায় ৬০০ শত হইব) পূরাপূরি (full kits) সজ্জিত হইয়া রাইফেল্ ও বেয়নেট সহ ট্রেনে করিয়া ওয়াটারলু ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশন হইতে ফিক্সট্ বেয়নেটে বিভিন্ন রাস্তা দিয়া মার্চ করিতে করিতে বেলা ১টার সময় বাকিংহাম প্রাসাদের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইলাম। মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বর সৈনিকের প্রধানতম অধ্যক্ষের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন।

আমরা সকলে সমতালে সম্রাটকে Royal Salute Present Arms (অর্থাৎ স্যালিউট করিবার ভঙ্গিতে বন্দুক ধরিয়া দাঁড়ান) করিলাম। এই

প্রেজেণ্ট আর্মস্‌এর মূল্য কি তাহা সৈনিকমাত্রেই বুঝিবেন—সাধারণকে বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। যাহা হউক সম্রাট প্রত্যেক লাইনের পথ দিয়া তাঁহার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধিবর্গকে পরিদর্শন করিয়া চলিলেন। ঠিক আমার সামনে তিনজন ভিক্টোরিয়া-ক্রস-ধারীকে একটি ভিন্ন লাইনে দাঁড় করানো হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সম্রাট আমাকে অতিক্রম করিয়া ঐ তিনজনের সাম্‌নে আসিয়া নিবিষ্ট মনে তাঁহাদের দেখিতে লাগিলেন। আমরা সকলেই ঐ সময় অ্যাটেনশন-অবস্থায় ছিলাম। সম্রাট ঐ তিনজনকে হিন্দিতে বলিলেন ;—

"সাবাস্ জোয়ান্; বহুৎ বাহাদুরী কিয়া।"

তৎপরে তিনি স্বহস্তে তাঁহাদের বক্ষে ভিক্টোরিয়া ক্রস মেডাল পরাইয়া দিয়া অগ্রসর হইলেন। ইহার পর তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(**True Copy**)

BUCKINGHAM PALACE.

It is with feelings of pride and gratification that I welcome here in my home this representative Contingent of British and Indian officers and men of my Army in India, and I am especially glad that this meeting should take place when we are celebrating Peace after Victory.

I deeply regret that unavoidable circumstances prevented your joining the Troops of the Empire and of our Allies in the Victory Procession on July 19th.

I thank the British Troops for their magnificent services in the Field. I gratefully recognise the prompt

and cheerful response of the Territorials to their country's call, their patient endurance of a prolonged separation from their homes and the sacrifices that they made in giving up their occupations in civil life. When temporary trouble arose in India they in common with their comrades from Mesopotamia who were on their way home of their free will remained at their posts (though their home-coming was at hand). The exemplary conduct of all has filled me and their countrymen with admiration.

I heartily thank all my Indian Soldiers for their loyal devotion to me and to my Empire, and for their sufferings cheerfully borne in the various campaigns in which they have served in lands and climates so different to their own. At times their hearts must have been sad at the long separation from their homes ; but they have fought and died bravely. They have rivalled the deeds of their ancestors : they have established new and glorious traditions which they can hand on to their children for ever.

I am glad to see among you representatives of the Imperial Service Troops and I thank the Princes of the Native States of India and their subjects for their noble response to the call made by me for the defence of the Empire and for the cause in which the Allies have fought and conquered.

I know you all unite with me in gratitude to God for the Victory that we have achieved. I trust you will

enjoy your visit to England. May you return in safety and take with you to your homes and villages my personal message of thanks and good will.

Saturday, August 2nd, 1919. (Sd.) GEORGE, R. I.

আমরা ষ্ট্যাণ্ড-অ্যাট-ঈজ অবস্থায় (অ্যাটেনশন অবস্থায় যেরূপ দাঁড়াইতে হয় তাহা অপেক্ষা কিছু শিথিলভাবে দাঁড়ানকে ষ্ট্যাণ্ড-অ্যাট-ঈজ বলে) এই বক্তৃতা শুনিলাম। অতঃপর পুনরায় Attention, slop arms এবং পরক্ষণেই রয়্যাল শ্যালিউট প্রেজেণ্ট আর্মস্ করা হইল। সম্রাট অভিবাদন গ্রহণান্তে বাকিংহাম প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং আমাদের ছুটি হইল।

ঐদিন আমরা রাজদর্শনে জীবন ধন্য মনে করিয়াছিলাম। আমরা সেইদিন রাজ-অতিথি হওয়ায় নানা প্রকার খাদ্য সম্ভারে বাকিংহাম প্রাসাদ প্রাঙ্গণে আমাদিগকে জলযোগ করানো হইল। জলযোগান্তে আমরা প্রাসাদ অভ্যন্তরস্থ উদ্যানে ঢুকিয়া ইতস্ততঃ চলাফেরা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম ঐ উদ্যানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করা হইয়াছে।

ইহার পর পুনরায় আমরা সমবেত হইয়া প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া সোজা রাস্তা ধরিয়া ওয়াটারলু রেল-ষ্টেশনে আসিয়া স্পেশাল ট্রেণে হ্যাম্পটন কোর্টে পৌছিলাম। তখন প্রায়. সন্ধ্যা হইযাছে—চতুর্দ্দিকের মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ক্যাম্পে প্রবেশ করিলাম। ইংল্যাণ্ডে আসিবার প্রধানতম কার্য্য শেষ হইল।

ইহার পর কিছুদিন সহরের নানাস্থানে ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইলাম। England এবং Scotlandএর যাবতীয় দর্শনীয় বস্তু আমাদিগকে

রাজসরকারের ব্যয়ে দেখান হইয়াছিল। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর আমাদের ভারতবর্ষে ফিরিবার দিন ধার্য্য হইল। হ্যাম্পটন কোর্টে থাকা কালীন বহু ভারতীয় ভদ্রলোকের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল।

লর্ড ও লেডি এস, পি, সিংহ আমাদের ক্যাম্পে দুইদিন আসিয়া আমাদের সঙ্গে নানা প্রকার আলাপ আলোচনা করেন। এখন হইতে বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় লইতে আরম্ভ করিলাম। এই ভাবে ৭ই কি ৮ই সেপ্টেম্বর আমরা সদলবলে টিলবেরি ডক্ ইয়ার্ডে উপস্থিত হইলাম। জাহাজ টেমস্ নদীর উপর দাঁড়াইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে আমরা সকলেই জাহাজে উঠিলাম। তখন বেলা প্রায় ১০টা হইবে।

আমরা আজ লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছি, আর জীবনে এস্থানে আসা হইবে কিনা সন্দেহ! মনে কেমন একটা দুঃখ হইল। ক্রমে জাহাজ ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই জাহাজে আমরা কেবলমাত্র এন্-সি-ওরা ভারত অভিমুখে রওনা হইলাম। জমাদার রণদা প্রসাদ সাহা ও সেপাই নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য হইতে আমি আবার পৃথক হইয়া গেলাম। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল ব্যানার্জ্জি আমার সহিত চলিলেন। আমাদের জাহাজ বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় ছাড়িল। বহু ইংরেজ নরনারী এবং ডক্ ইয়ার্ডের কর্ম্মচারী রুমাল ও টুপী আন্দোলন করিয়া আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানাইলেন। আমরা নীরবে জাহাজের রেলিং ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। ক্রমে লণ্ডন সহর আমাদের চক্ষের অন্তরাল হইল। তথাপি ডেকের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া চক্ষু এবং অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইয়া টেমস্ নদীর উভয়তীর দর্শন করিতে করিতে চলিলাম। জাহাজের অপর ব্যক্তিগণ কে কি করিতেছিলেন তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি নিজে কাহারো সহিত বাক্যালাপ না করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ইংলিশ চ্যানেলে গিয়া পড়িলাম। ইংলণ্ডের তীরভূমি ক্রমেই দুর হইতে দূরতর হইতে লাগিল এবং ক্রমে উহা অস্পষ্ট হইল। সন্ধ্যাকালে অস্তমিত সূর্য্যকিরণে গভীর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ইংরেজের দেশ ও ইংরেজ জাতির নিকট হইতে বিদায় লইলাম।"

বিখ্যাত জার্নালিস্ট সেণ্ট নিহাল সিংহ লণ্ডন ভিক্টোরি-প্রশেসন সম্বন্ধে কোন এক লণ্ডন কাগজে যে চিঠি লিখেছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করছি :—

Indian Troops in England

AN IMPRESSION

St. Nihal Singh writes in a London paper :—

As I sat on the Indian office stand waiting for the arrival of the Indian procession I saw sitting near me members of the various Indian deputations, who are in London to put the Indian case before the Joint Indian Parliamentary Committee. Here and there an Indian in a turban and an Indian lady in a Sari were to be seen.

As soon as the Indian officers carrying the bannars came in to the line of vision enthusiastic cheering broke out on all sides. It seemed to me that the spectators who lined the Mail, and stood on the stand, let themselves go in order to make up for the disappointment they had had of missing the Indian from the victory procession.

The tall, stalwart Sikhs, with their beards rolled up tightly against their cheeks, and their khaki turbans were

easily recognised by everyone, and I heard universal praise of the smart appearance they presented. The short, dapper Gurkhas, with their soft hats like the "Aussies" were also easily recognised and warmly cheered. Men of other races and creeds were not so easily detected by persons who had no special knowledge of Indians.

But almost all the Indian races and clans that have fought in the war were represented.

The well-built fair skinned Pathans the tall lithe Dogra-proud of his Rajput (Kingly) blood AND EVEN THE BENGALI—WHOM THE WAR GAVE THE CHANCE TO WIPE OUT THE STIGMA OF COWARDLINESS MOST UNJUSTLY PLACED UPON HIM BY MACAULAY—WAS THERE.

"*The Bengalee*"

Sunday, September 7, 1919.

স্মৃতিস্তম্ভ

বাঙালী রেজিমেন্টের যে সব বীর সন্তানের মৃত্যু হয় তাদের উদ্দেশ্যে কলেজ-স্কোয়ারে একটি স্মৃতিস্তম্ভ হ'ল। সেই সময় ১৯২৪, ৫ই আগষ্ট তারিখের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় এই সংবাদটি বেরিয়েছিল।

49th Bengalis

Memorial Erected in College Square.

A memorial to fallen members of the 49th Bengali Regiment has just been erected in College Square, Calcutta.

Constructed of pure white Carrara marble, the memorial is in the form of an obelisk and stands 9 feet high. The following inscription appears on one side of the square-shaped base :-

"In memory of the members of the 49th Bengali Regiment, who died in the Great War 1914-19. To the glory of God, King and Country."

On the other three sides are engraved the names of the dead, 56 in all, with their respective districts and the dates on which they died.

Unpretentious though the memorial is, it is

nevertheless artistic and of graceful proportions. Surrounded by an abundance of green foliage, the crystal whiteness of the monument is brought into vivid relief by the clear water of the College-Square tank. A more appropriate site could not perhaps have been chosen, seeing that College Square is daily frequented by thousands of Bengalis.

The 49th Bengali Regiment may perhaps be regarded as one of the many tangible evidences of the wave of patriotic favour which swept over India at the declaration of the Great War. The movement for the formation of a Bengali unit was inaugurated at a great demonstration in the Town Hall over which Lord Carmichael presided. A Double Company was at first formed, which as the War wore on and the need for more men was felt was turned into a regiment. The 49th Bengalis served with the Mesopotamian Expeditionary Force.

The memorial has cost Rs. 4500 which has been defrayed by the Army authorities. Messrs. Llewellyn and Company are the architects.

সাড়ে চার হাজার টাকা ব্যয়ে মহাযুদ্ধে বাঙালীর এই গৌরবময় স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হ'ল—যা ভবিষ্যৎ বাঙালীকে তার জাতীয় বীরত্ব স্মরণ করিয়ে দেবে এবং আত্ম শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

মহিলা সমিতির তহবিলে যে টাকা ছিল সেই টাকা এই
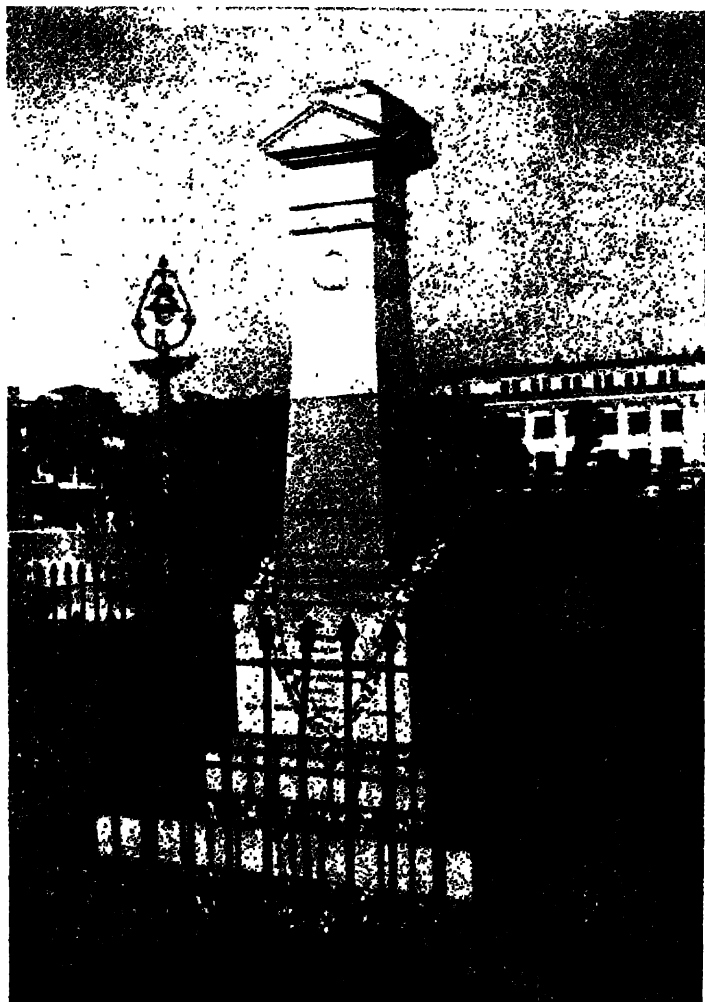
বাঙালী মৃত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ।
কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতা।

স্মৃতিস্তম্ভ রচনায় সাহায্য করেছে। সমিতি সেই টাকা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে বাঙালী পল্টনের স্মৃতি রক্ষার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। আমার সৈনিক বন্ধু সুবেদার হীরেন্দ্রনাথ সরকার ভূতপূর্ব্ব সৈনিকদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে মৃত সৈনিকদের সম্মানার্থে এই স্মৃতিস্তম্ভ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করতে সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। বাঙালী পল্টনের একটি এক্সসার্ভিস এসোসিয়েশন থাকা প্রয়োজন সেইজন্য সুবেদার মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কয়েকজন পল্টনের অফিসার ও কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক দ্বারা ১৯২০ সালে Indian Association Hallএ প্রথম সভা আহূত হয়।

Bengali Ex-Soldier Association

FIRST INAUGURAL MEETING

There was a fairly large gathering at the inaugural meeting of the Bengali Ex-Soldiers' Association under the presidency of the Hon'ble Sir Deva Prasad Sarbadhikary held in the Indian Association Hall on Friday evening. After the object of the Association was explained by Subedar Major S. N. Bose Bahadur, the President in a neat little speech stated that it was a very useful institution and should have been formed earlier.

The first resolution was moved by the Hon'ble Mr. P. C. Mitter. "That the Bengali Ex-Soldiers' Association be formed."

It was seconded by Kumar M. C. Singh of Paikpara and carried unanimously.

The provisional committee was formed with the following gentlemen with the power to add to their number :—

The Hon'ble Sir D. P. Sarbadhikary.
Lieut Colonel S. P. Sarbadhikary.
Nawab Khaja Habibullah Bahadur of Dacca.
Kumar Monindra Chandra Singh of Paikpara.
Babu Kristo Kumar Mittra.
The Hon'ble Mr. P. C. Mitter.
Mr. Satyananda Bose.
Mr. J. N. Banerjee.
Mr. Nibaran Chandra Roy.
Subedar Major S. N. Bose Bahadur, I. D. S. M.
Subedar Major K. A. Majumdar.
Subedar A. N. Chatterjee.
Jamadar B. M. Roy.
Jamadar N. V. Mukherjee.
Ex-Habilder S. C. Mittra.
J. N. Panday.
P. K. Das.

with a vote of thanks to the chair the meeting separated.

"*The Bengalee*"
28th February, 1920.

১৯২৭ সালে সুবেদার হীরেন্দ্রনাথ সরকারের উৎসাহে ও উদ্যোগে সুবেদার মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালী পল্টনের বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা আগড়পাড়া গার্ডেনহাউসে দ্বিতীয় সভা হয় এবং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ একটি বাড়িতে দোতালার একটি ঘর ভাড়া নিয়ে অল্প সংখ্যক সভ্য মিলে বেঙ্গলী এক্স-সার্ভিস এসোসিয়েশন হল সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পরে এই এসোসিয়েশন কলেজ ষ্ট্রীটের একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় এবং এসোসিয়েশনের সভ্য-সংখ্যা ক্রমেই বাড়্‌তে থাকে। প্রতি বৎসর ১১ই নবেম্বর ১১টার সময় কলেজ-স্কোয়ার স্মৃতিস্তম্ভের কাছে এসোসিয়েশনের সভ্যগণ, কলিকাতা দুর্গ থেকে একদল সৈন্য এবং বিভিন্ন স্থানের স্কাউটদল একত্র মিলিত হ'য়ে মৃত সৈনিকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

সৈনিকদের প্রতি দেশের সাধারণ লোকের উদাসীনতা আছে এবং সেই উদাসীনতা দূর করবার জন্যই ধীরে ধীরে যে সব আয়োজন চল্‌ছিল গোড়া থেকেই তার প্রধান পুরোহিত ছিলেন ডাক্তার এস্ কে মল্লিক। তিনি ছিলেন আমাদের প্রধান ভরসাস্থল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক এই সময় তাঁর মৃত্যু হ'ল। তিনি দিল্লীতে বেঙ্গল টেরিটোরিয়াল ফোর্স সম্পর্কে কাজে যান কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আস্‌বার পর তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তারপর সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হ'য়েই হঠাৎ তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হ'য়েছিল মাত্র ৫৪ বৎসর।

তিনি ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি। সেইখানে তিনি কয়েক বৎসর চিকিৎসাব্যবসা করেন এবং অনেকগুলি বড় হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন। লণ্ডন থেকে ক'লকাতা ফেরেন তিনি ১৯০২ কি ১৯০৩ সালে। বাঙালীদের মধ্যে বিলেত যাওয়া বিষয়ে যাঁরা বাঙালীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন তিনিও তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি ক'লকাতায় এসে চিকিৎসা ব্যবসায় স্থরু করেন। তিনি ছিলেন ফুস্‌ফুস্‌ বিষয়ক ব্যাধির বিশেষজ্ঞ।

জনহিতকর কাজে তিনি পরম উৎসাহী ছিলেন। এবং এতেই তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হ'ত। বাঙালীদের মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যার প্রসার কামনায় তিনিই সার্কুলার রোডের "ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল"টি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনি বাঙালী ছেলেদের সামরিক শিক্ষার জন্যে যা করেছেন তাইতেই বাঙালী জাতির ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হ'য়ে থাক্‌বে। সামরিক শিক্ষা ব্যতীত ভারতবর্ষ যে স্বায়ত্তশাসন লাভের যোগ্য হবে না এইটেই ছিল তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস। সেই জন্যেই তিনি বাঙালী সৈনিক রিক্রুট কর্‌বার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাঁর এই চেষ্টা এবং যত্ন না হ'লে বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট আদৌ গ'ড়ে উঠ্‌তো কিনা সন্দেহ। এই মহৎ কাজের জন্য রাজ সম্মানও তিনি লাভ ক'রেছিলেন। যুদ্ধের পর সি, বি, ই (Companionship of the British Empire) উপাধিতে ভূষিত হ'য়েছিলেন।

দুঃখের বিষয় বাংলার এই সুসন্তানের স্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আজও হয়নি।

পরিশিষ্ট

প্রত্যেক দেশে শান্তির সময় অবস্থানুযায়ী একটি "ষ্ট্যাণ্ডিং আর্মি" রাখার ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষেও সেইরূপ একটি ষ্ট্যাণ্ডিং আর্মি আছে। বহিঃশত্রুর অক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য—অথবা আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সকল দেশেই এইভাবে স্থায়ী সেনাদল রাখা হয়। দেশের অবস্থা ভেদে সৈন্যসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু যুদ্ধ বাধলে ঐ সৈন্যসংখ্যা ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বা জেলা থেকে অতিরিক্ত লোক সংগ্রহ ক'রে, তাদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। তারপর যুদ্ধ মিটে গেলে নূতন সৈন্যদলের কাজ ফুরিয়ে যায়—এবং তাদের দল ভেঙে দেওয়া হয়। মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে যে নূতন সৈন্যদল তৈরী ক'রে, (ফর্টিনাইন বেঙ্গলী প্রভৃতি) যুদ্ধের কাজে লাগান হয়েছিল, সেইসব দলকেও যুদ্ধশেষে ভেঙে দেওয়া হ'ল। প্রায় ৭০০০ সাত হাজার বাঙালী, বাঙালী-সেনাদলে যোগ দিয়েছিল।· এদের মধ্যে প্রায় ২০০০ সৈনিক মেসো-পটেমিয়া এবং কুর্দ্দিস্থানের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত ছিল—এবং বাদবাকী সৈন্য করাচী ডিপো ও দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টে শিক্ষায় নিযুক্ত ছিল।

বাঙালী সৈনিকদের আবির্ভাব এবং তিরোধানের মধ্যেকার সময় খুব বেশি নয়—তিন চার বছর। ভারতীয় অন্য প্রদেশের

সৈন্য হ'লে এসম্বন্ধে কোন কথা বলবার ছিল না, কিন্তু বাংলা দেশের কথা স্বতন্ত্র। হঠাৎ মনে হ'তে পারে বাঙালী সেনাদল সৃষ্টি একটা লোকদেখান ব্যাপার—এরা সৈন্য হবার উপযুক্ত নয়—ইতিপূর্ব্বে হয়নি—এবং সেইজন্যেই এ একটা মরীচিকা—মরীচিকার মতই শূন্যে মিলিয়ে গেছে। আসলে কিন্তু তা নয়। একটি লোক পূর্ব্বে মরেনি ব'লে যেমন বলা যায় না যে সে কোনদিনই মরবে না—তেমনি, বাঙালী পূর্ব্বে সেনাদলে যোগ দেয়নি ব'লে কোনদিনও সে সেনা হবার উপযুক্ত নয় একথা বলা যায় না। বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী মহাযুদ্ধে গিয়েছিল একটা ভাবাদর্শে, একথা ঠিক। কিন্তু বাঙালীকে নিয়ে স্থায়ী সেনাদল গঠন করতে হ'লে বাঙালীর মধ্যে এমন কোন কোন সম্প্রদায় আছে যাদের দিকে দৃষ্টি দিলে একাজ সহজে হ'তে পারে। নমঃশূদ্র এবং রাজবংশী বাঙালীরা সেনা হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। মুসলমানদের মধ্যেও কোন কোন শ্রেণী উপযুক্ত। স্থায়ী সেনাদল ভবিষ্যতে এদের দ্বারাই গঠিত হবে ব'লে আমার বিশ্বাস তবে মেকানাইজড আর্মির জন্য হয়ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীকেই নিতে হবে।

কিন্তু সে কথা যাক। বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় দ্বারা গঠিত হ'লেও এই রেজিমেণ্টও যে সৈন্যপদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব'লে সামরিক বিভাগ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল তার প্রমাণ পূর্ব্ব অধ্যায় সমূহে সবিস্তারে বর্ণিত হ'য়েছে। এইবার সংক্ষেপে বাঙালী সেনাদের মূল্য নিরূপণ করছি। এতে আমার বক্তব্য আরও পরিষ্কার হবে।

(১) সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে মাত্র ২২৮ জনকে নিয়ে যে একটি ডাবল কম্পানি গঠিত হয়, পরবর্ত্তীকালে এই ডাবল্ কম্পানি ব্যাটালিয়ান ও রেজিমেণ্টে পরিণত হয়েছিল।

(২) ভারতীয় সমরবিভাগ বাঙালীকে ভারতীয় পল্টনের মধ্যে একটি স্থান দিয়েছিল।

(৩) পল্টনের বিশেষ নামকরণ হয়েছিল।

(৪) সুদক্ষ সামরিক শিক্ষক বাঙালীকে সামরিক শিক্ষা দিয়েছিল।

(৫) বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের গভর্ণরগণ বাঙালী পল্টনের বিশেষ সুখ্যাতি করেছিলেন ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। মহামান্য লর্ড রোনাণ্ডসে (লর্ড জেটল্যাণ্ড, ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব) বাহাদুরের বক্তৃতা বিশেষ স্মরণীয় ঃ—

Recruiting Meeting at Dacca

H. E. THE GOVERNOR'S SPEECH

(Associated Press of India)

Dacca, Mar. 9. 1918.

In course of his speech His Excellency the Governor said :—

"After the eloquent appeals for recruits to which we have already listened, it may seen almost superfluous for me to add another. Nevertheless, as the Governor of the Presidency, I do join with those who have already addressed you in appealing to the

people of Eastern Bengal not to let pass unheaded the opportunity which is now given to them of taking their rightful place in the glorious armies of His Majesty the King-Emperor.

It is said the successful man is the man who recognises an opportunity when it comes and does not hesitate to seize it.

What is true of individuals is true of nations. A people that neglects an opportunity when it comes may wake up some day to find that the opportunity has gone never to return. I have no desire whatsoever to minimize the gallantry and patriotism of the young men of Bengal, who have already come forward to serve their King and country.

On the contrary I gladly take this opportunity of expressing the admiration which I feel for their public spirit and their courage.

But I want to see many more of them. I am told that up to the present time the number of soldiers actually recruited in the Dacca Division is less than three hundred.

Supposing that the war were to come to an end to-morrow, would the people of the Dacca Division be satisfied to think that of their millions they had sent 300 men only to fight for the honour and reputation of their motherland? Have you not asked time and again through your public men that the army should be thrown open to you as a

carrer ? Well, your opportunity has come. Seize it while there is yet time. It is for you to vindicate your claim to stand side by side in comradeship with the sololiers of the King.

I gladly recognise the services of those in the Dacca district who have worked to assist us in the war.

Three motor ambulances have been built and equipped for services in Mesopotamia.

I thank all those who have been concerned for that. I thank too the ladies of Dacca, both Indian and European for the work which they are doing in providing comfort for the troops. I thank too all those who have generously subscribed to the Dacca Ladie's War Fund and in particular Srimati Sarajabala Devi of Bhowal, Babu Ramanath Ray of Kapasia, Babu Harendralal Ray of Bhagyakul, the Estate of Srimati Ananda Kumari Devi of Bhowal and Babu Ramanath Das and his mother.

But all I thank those who have given up their time and energy in connection with the recruitment of men—Dr. Mead of Faridpur for his work in connection with the labour crops, Babu Suresh Chandra Chakrabarty, Secretary of the local Recruitment Committee of Kishorgunj and Mr. K. C. Nag who has devoted much time to touring the district of Mymensingh and holding recruiting meetings.

In Dacca itself much hard work has been done.

My thanks are due to Babu Gour Netai Sankhanidhi who has both subscribed to recruiting funds and provided accommodation for the recruits, to Khan Bahadur Muhammad Azam, President of the Dacca Recruiting Committee. My thanks are also due and last but not least to Babu Srish Chandra Chatterjee, the indefatigable, Secretary of the Dacca Recruiting Committee.

These are no idle workers when I say that I am indeed grateful to all these gentlemen for what they have done.

But it is for the youngmen of Dacca themselves to see that the time and labour which they have given have not been given in vain.

To them I say 'hesitate no more but follow quickly in the foot steps of those who have already shown the way'.

"The Bengalee"
Sunday, March, 10, 1918.

(৬) বাঙালীকে সুদূর মেসোপটেমিয়া ও কুর্দিস্থান যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হয়েছিল।

(৭) ভারতবর্ষে, মেসোপটেমিয়ায় এবং কুর্দিস্থানে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ জেনারেলগণ সকলেই বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট পরিদর্শন ক'রে বিশেষ সুখ্যাতি করেছিলেন। রেজিমেণ্টের অফিসারগণও সুখ্যাতি করেছিলেন।

রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডিং অফিসার ভি, ভি, ভি, সাণ্ডিফোর্ড মেসোপটেমিয়া থেকে ডাক্তার মল্লিককে যে চিঠি লিখেছিলেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল :—

49th Bengalees
Mesopotamian Expeditionary Force
Busra 30th Jany. 1920.

From
Lieut. Col. V. V. V. Sandiford
Commanding 49th Bengalees

To
The Honorary Secretary
The Bengalee Regiment Committee
18/1 Beadon Street, Calcutta.

Dear Dr. Mullick,

Reference to your letter dated January 6th 1920, regarding the Company of this unit that proceeded to Kurdistan last hot weather. I send herewith the following particulars.

The company that went from the unit was not any particular Company, such as A. S. C. etc., but a company selected from men in the unit, who volunterred 210 Indians of other Ranks besides the 3 British and 5 Indian officers went with the company from Tanuome (Busrah) where the unit was stationed at the time.

The men volunteering were very anxious to go to Kurdistan and enthusiastic and cherry on the way up to the South Kurdistan Force, and throughout the operations they were engaged on. This journey by boat, rail and marching entaitled considerable power of endurance from the men, undertaken as it was in the middle of the hot weather. The marches were long, continuous and water was not plentiful but had to be carefully husbanded. The distance coverd in marching was just under 150 miles, which was covered in 12 days including a 2 days' halt after the first 90 miles.

Although the long marches hold on a number of men who had to fall out, the men were cheerful throughout and stuck to it extraordinary well. Each day on arrival at the camping site tents had to be pitched and again struck before moving on to the next camp which entaitled more fatigue. On arrival at the rendezvous of operations in Kurdistan, the company proceeded at once as a punitive column. At the conclusion of the operations of this column which necessited marching nearly every day, also the surrounding and searching of villages, the company was sent to a post, two marches distant on the lines of communication as portion of the Garrison. After a short period the company was again ordered on another punitive one.

Whilst on the lines of communication they were

employed continuously on picquetting work guarding communications. At the conclusion of the operations of the 2nd column, the company was sent to the town where Force Headquarters were as a portion of the then Garrison and after a short stay at this latter place rejoined the Regiment at the Base.

The men were cheerful and keen throughout, and I think, carried out their duties very satisfactorily under very difficult conditions at times.

The company saw no actual fighting before the arrival of the company in Kurdistan.

The operations they were on, however carried out under action conditions for any opposition that the Kurds might make.

Yours sincerley
Sd/ V. Sandiford
Lieut Colonel.

"*The Bengalee*"
Sat. July, 10, 1920.

(৮) যুদ্ধশেষে ভারত সম্রাট বাঙালীকে শান্তি উৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

(৯) বাঙালী রেজিমেণ্টের জন্য কয়াচী ডিপো, দমদম-ক্যাণ্টনমেণ্ট এবং মেসোপটেমিয়া ও কুর্দিস্থানের সমরবিভাগে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন।

(১০) প্রতি বৎসর ১১ই নবেম্বর সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা দুর্গ থেকে একটি বন্দুকধারী সৈন্যদলকে, কলেজ-স্কোয়ারে মৃত বাঙালী সৈনিকদের সম্মান রক্ষার্থ পাঠিয়ে থাকেন।

(১১) যুদ্ধশেষে বাঙালী রেজিমেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়া হয়—তার কারণ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।

Mr. Banerjee's Telegram
to
Commander-in-Chief

C. C'S REPLY

In reply to the telegram sent by the Hon'ble Mr. Surendra Nath Banerjee on the subject of the disbandment of the Bengalee Regiment, the Commander-in-chief has telegraphed to Mr. Banerjee to say that His Excellency fully realised that the disbandment of the 49th Bengalee would cause disapointment to those who had worked so hard to raise and maintain the Battalion but he could not see how a purely military question of this kind could affect the question of Co-operation between Government and the people on the large question affecting responsible Government. Government was compelled by financial necessities to disband the supplementary battalion raised during the war and in applying this principle to the Bengalee Battalion they were dealing with the latter in exactly the same way as other units raised at the same time and under similar conditions.

The Commander-in-chief further adds that the questions of the formation of a territorial force

in India is under considerations and if this proposal materialises such a force would provide a suitable outlet for Bengali Military activities.

"The Bengalee"
24th June, 1920.

পৃথিবীতে সব সময় সব দেশে যুদ্ধ হয় না। কিন্তু তবুও প্রত্যেক দেশেই সৈন্য প্রয়োজন। এমন সৈন্য আছে যারা আজীবন শান্তি ভোগ করেছে এবং পেন্‌শেনও ভোগ ক'রেছে, কিন্তু জীবনে কখনও যুদ্ধ করেনি অর্থাৎ যুদ্ধ কর্‌বার সুগোগ পায়নি। সুতরাং সেনাদল গঠন কর্‌লেই বা সেনা হ'লেই যে সর্ব্বদা যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে এমন কোন কথা নেই। তবে যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। জীবিকার্জ্জন হিসাবে এবং সহজভাবে সৈনিক জীবনকে গ্রহণ ক'র্‌লেই সব সমস্যার সহজ মীমাংসা হ'য়ে যেতে পারে। বহু লোকের জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা এতে হয় সেদিক দিয়েও এটা ভাবা উচিত এবং সুযোগ পেলে তা গ্রহণ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

ফর্টিনাইন বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের জন্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে যথেস্ট সুবিধা ক'রে দিয়েছিলেন, এবং বাঙালী যুবকেরাও তার যথোপযুক্ত প্রতিদান দিয়েছিল।

আমি এক সময়ে আমাদের কম্যাণ্ডিং অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—বাঙালীকে 'রেগুলার আর্মি'তে রাখা হবে কি না।

তিনি সে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন,--নিশ্চয়ই রাখা হবে যদি তারা চায়। কিন্তু বাঙালী তখন চায় নি—এর জন্যে অবশ্য বাঙালী নেতাদের উদাসীনতা অনেকখানি দায়ী। কয়েকজন ভারতীয় (বাঙালী) অফিসার এ বিষয়ে নেতাদের কাছে দরবারও করেছিলেন—কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন—যুদ্ধই যখন থেমে গিয়েছে তখন পল্টনের আর দরকার নেই। বাঙালী রেজিমেণ্ট গড়ে তুলতে হ'লে বর্দ্ধমানের মহারাজা মিঃ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি ও ডাক্তার এস কে মল্লিকের মত উৎসাহী নেতা প্রয়োজন। আর একদিকে আরও প্রয়োজন পূজনীয়া শিশির কুমারী মল্লিক (মিসেস্ এস, কে, মল্লিক) ও সরলা দেবীর মত উৎসাহী কর্ম্মী মাতা। পূজনীয়া সরলা দেবী চৌধুরাণী সে সময় যে ভাবে বাঙালী জাতিকে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলছিলেন, তার নিদর্শন স্বরূপ নিম্নে একখানা চিঠি উদ্ধৃত করছি।

The following letter addressed to Mrs. Sarala Devi Choudhurani by Mr. K. C. De C. I. E. Commissioner Chittagong Division will be read with great interest.

Commissioners' Office
Chittagong
The 20th August, 1919

Dear Sarala Devi,

You have asked me to say what you did to

help recruiting in my Division, your services to the cause in Bengal have already been commended by Sir Charles Monro in his Despatch, I add to that by saying that you re-kindled the enthusium when our endeavours had failed and popular feeling had subsided, your speeches drew the attention of the Mohammadans who were so long keeping away and your earnestness fervour brought fresh life to the movement and greatly increased the rates of recruiting in Chittagong Division, Suakund and Agartola.

We had been supplying a large number of non-combatants but on combatant recruits were very few and after you came that we succeeded in inducing the lower classes, particularly the Mahamadans to join the combatants ranks. This was to a great extent due to your effects and we are all deeply grateful to you.

Permit me to express our heartfelt sympathy in your present troubles and to express our hope that your husband will soon be restored to you.

I remain,

Yours Sincerely,
Sd/ K. C. De.

"*The Bengalee*"
Sunday, September 7, 1919.

আশা রইল একদিন আমার জীবিতাবস্থাতেই আবার বাঙালী রেজিমেন্ট দেখে যেতে পারবো।

মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী।

মিঃ বি, কে, লাহিড়ী

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে ইঁহারা বেঙ্গল আম্বুলেন্স কোর, বেঙ্গলী ডাবল্ কম্পানি ও বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের জন্য যথেষ্ট কাজ করেছিলেন।
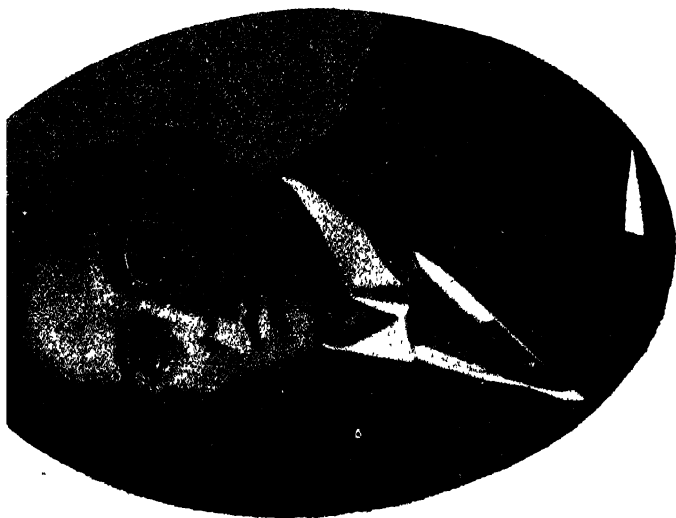
সাত হাজারের উপর বাঙালী সৈন্য—তাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করতে পারলে আনন্দ হ'ত, কিন্তু এই গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট পরিসরে তা করা সম্ভব হ'ল না। কাজেই মেসোপটেমিয়া করাচী ও দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টে যে সকল ব্রিটিশ ও ভারতীয় অফিসার বাঙালী পল্টনে ছিলেন তাঁদের নাম যা আমার স্মরণ আছে তাই উল্লেখ করছি।

—যুদ্ধক্ষেত্রে—

কর্ণেল এ এল্ ব্যারেট ডি এস-ও, কর্ণেল ভি ভি ভি স্যাণ্ডিফোর্ড, মেজর জি জি পিয়ার্স, মেজর অ্যাডলার, ক্যাপ্টেন সি-জি ওয়েবষ্টার, জে জোন্স, ক্যাপ্টেন ফ্রিট্স্হাবার্ট, ক্যাঃ গর্ডন, ক্যাঃ এস-জি টেলর, ক্যাঃ স্মিথ, ক্যাঃ শেফার্ড, ক্যাঃ বেটি, ক্যাঃ গিবস্, ক্যাঃ মরিস্, ক্যাঃ লঙ্, ক্যাঃ বি-জে এমিস, ক্যাঃ ভি গুপ্তে (মেডিক্যাল অফিসার) লেপ্টেন্যাণ্ট ব্লুম্‌বি, লেঃ ফ্রুক্স্, লেঃ ডানিং, লেঃ অ্যাটকিন্‌সন ইত্যাদি।

—করাচী ডিপোতে—

মেজর আর ডি ই ড্যারেল, ক্যাপ্টেন জি পি হগ আই. সি, এস (চীফ্ সেক্রেটারী—গভর্ণমেণ্ট অব্ বেঙ্গল), ক্যাঃ আর ডি ডগ্‌লাস্ আই, সি. এস, ক্যাঃ জে উবলিউ টি কলসি, ক্যাঃ উইলকিন্স, ক্যাঃ এম পি ওয়েষ্ট, ক্যাঃ হার্টলি, লেপ্টেন্যাণ্ট জে এইচ্ জোন্স, লেঃ ওয়াটসন এম, সি, (অর্থাৎ মিলিটারী ক্রস) লেঃ জে আর জনসন্, লেঃ মিলস, লেঃ গ্রিফেন, লেঃ হেই (মেডিক্যাল অফিসার) ইত্যাদি।

—দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টে—

ক্যাপ্টেন ম্যাকগেভিন।

মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি।

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে ইনি বেঙ্গলী ডাবল্ কম্পানির
সঙ্গে যথেষ্ট কাজ করেছিলেন।

ভারতীয় অফিসার

(যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন)

১। সুবেদার মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বোস, "বাহাদুর" আই, ডি, এস, এম।

২। „ কুমার অধিক্রম মজুমদার।

৩। „ অরুণকুমার মিত্র।

৪। „ অনাদিনাথ চাটার্জি।

৫। „ দুর্গাপদ ব্যানার্জি।

৬। „ ধীরেন্দ্রকুমার সেন।

৭। „ হীরেন্দ্রনাথ সরকার।

৮। „ মনবাহাদুর সিংহ।

৯। „ ফণীভূষণ দত্ত।

১০। „ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

১১। „ বীরেশ্বর মুখার্জি।

১২। „ প্রমথনাথ সাঁতরা।

১৩। „ রাজেন্দ্রলাল মুখার্জি।

১৪। জমাদার ভূমেন রায়।

১৫। „ কিরণকুমার মিত্র।

১৬। „ শচীন্দ্রনাথ রায়।

১৭। „ প্রকৃতিকুমার ঘোষ।

১৮। „ নবাব বাহাদুর—ঢাকা।

(বর্ত্তমানে The Hon'ble Lt. Nawab Khwaja Habibullah Bahadur of Dacca, Minister i/c Industries and Local Self-Government)

বেঙ্গলী বেজিমেণ্টেব ভাবতীয অফিসাবগণেব একাংশ।
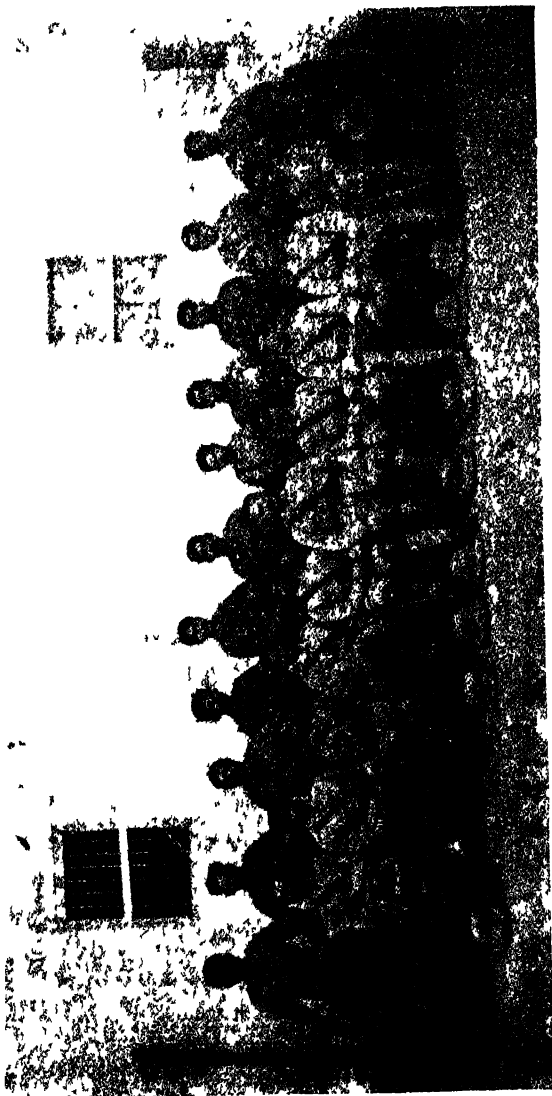
বামদিক হইতে দণ্ডাযমান—জমাদাব বঙ্কিম মুখার্জি, নিতাই সিংহ, মণিরুদ্দীন আহাম্মদ, চিন্তামণি বোস, ধীবেন গুপ্ত, জ্ঞান ব্যানার্জি, ফণী লাহিড়ী, মণি মুখার্জি, গোষ্ঠ ঘোষ, শচীন ভৌমিক, এবং ননী ধব।
উপবিষ্ট—জমাদাব নাবাযণ বায চৌধুবী, শচীন বায, গোপাল ঘোষ. সুবেদাব প্রমথ সাঁতবা, জমাদাব বণদা সাহা, সুবেদাব মেজব শৈলেন বোস বাহাদুব, আই, ডি, এস এম্, সুবেদাব বীবেশ্বব মুখার্জি, বাজেন মুখার্জি, জমাদার [illegible] রায জমাদার প্রকৃতি ঘোষ এবং শম্ভু রায।

১৯। জমাদার গোপালচন্দ্র ঘোষ।
২০। " যশোদাকিঙ্কর ঘোষ।
২১। " নগেন্দ্রবিহারী মুখার্জি।
২২। " শান্তি কর।
২৩। " খগেন্দ্রনাথ বোস।
২৪। " কানাইলাল মুখার্জি।
২৫। " জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
২৬। " প্রতাপচন্দ্র রায়।
২৭। " নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। সাব্ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সারজন জোশী
(মেডিক্যাল অফিসার) ইত্যাদি।

(করাচী ডিপোতে যাঁরা ছিলেন)

২৯। জমাদার রণদাপ্রসাদ সাহা।
৩০। " শম্ভু রায়।
৩১। " গোষ্ঠবিহারী ঘোষ।
৩২। " নারায়ণ রায় চৌধুরী।
৩৩। " ফণী লাহিড়ী।
৩৪। " জে, এন, চক্রবর্ত্তী—ইত্যাদি।

এ্যাক্‌টিং ভারতীয় অফিসারগণের নাম ঃ—

৩৫। জমাদার বঙ্কিম মুখার্জি।
৩৬। " নিতাই সিংহ।
৩৭। " মণিরুদ্দিন আহম্মদ।
৩৮। " চিন্তামণি বোস।

করাচী হেড কোয়ার্টার্সে সৈনিক জীবন হইতে বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের সর্ব্ব শেষ দল।
দণ্ডায়মান—নায়ক মহম্মদ আশান, ল্যান্স নায়ক এইচ্ বোস, এস্, এন্ দে, সেপাহী জে, বোস, হাবিলদার জি, দত্ত, ল্যান্স নায়ক এস্ মুখার্জি, হাবিলদার মেজর এম্ মজুমদার, হাবিলদার কে, ব্যানার্জি।
উপবিষ্ট- কোয়ার্টার মাষ্টার স্যুবেদার ফণি দত্ত, কোয়ার্টার মাষ্টার লেফ্টেন্যাণ্ট গর্ডন, কমাণ্ডিং অফিসার লেঃ

৩৯। „ ধীরেন গুপ্ত।

৪০। জমাদার জ্ঞান ব্যানার্জি।

৪১। „ মণি মুখার্জি।

৪২। „ শচীন ভৌমিক।

৪৩। „ ননী ধর।

(দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টে যিনি ছিলেন)

৪৪। জমাদার শরৎ কুমার রায়।

বড়লাট বাহাদুর ভারতীয় কমিশনড্ র‍্যাঙ্কের যে সনদ দিয়ে থাকেন, তারই একটি নমুনা—

Name—Arun Kumar Mitter.

Bengali Battalion.

The Viceroy and Governor General of India in Council reposing Special Trust in your Loyalty, Courage and Good Conduct, in the name of His Most Exalted and Illustrious Majesty King George V, Emperor of India, does hereby nominate and appoint you to be an Officer in His Majesty's Indian Army from the thirtieth day of June—one thousand nine hundred and seventeen. You are therefore carefully and diligently to discharge your duty as such in the rank of Jamadar or in such higher rank as you may from time to time be promoted or appointed to, of which a notification will be made in the Gazette of India and you are at all times to exercise and well discipline in arms the inferior Native Officers, Native Warrant Officers

আর্মিস্‌টিস্‌ ডে, ১১ই নবেম্বর ১৯৩৯।

মৃত বাঙালী সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভের নিকটে দণ্ডায়মান শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস্‌, বেঙ্গলী এক্স্‌-সার্ভিস্‌ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মহারাজকুমার বি, এন, রায় চৌধুরী, খান্‌ বাহাদুর ফজ্‌ল্‌ এলাহি বক্স (ভূতপূর্ব্ব শেরিফ) ও বেঙ্গলী এক্স্‌ সার্ভিস এসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দ।

and men serving under you and use your best endeavours to keep them in good order and discipline.

And all such inferior Native Officers, Native Warrant Officers and men are hereby commanded to obey you as their Superior Officer.

You are to render every assistance in your power to your Commanding or any Superior Officer in the maintenance of good order and discipline.

You are to obey implicitly at all times the Orders of the Government of His Illustrious and Exalted Majesty, of His Excellency the Commander-in-chief, of your immediate Commanding Officer or any other of your Superior Officer and by the strict discharge of your duties, and by your own conduct to show yourself worthy of the honour and high distinction now conferred upon you, and the trust reposed in you by his Most Exalted and Illustrious Majesty.

Given under the hand and seal of the Government of India this tenth day of September in the year of Our Lord, One thousand nine hundred and seventeen.

Registered by order in the Secretary's Office, Army Department.

Sd/-A. H. Bingley

No. 3064 Major General.

Secretary to the Govt. of India,

Army Department.

কলিকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিমূর্ত্তি উন্মোচনে বেঙ্গলী এক্স সার্ভিসের প্রতিনিধিবৃন্দ।

বাম দিক হইতে—দণ্ডায়মান পি, সি, ব্যানার্জ্জি, প্রতাপ রায়, জিতেন সেন গুপ্ত।

আজ ইউরোপীয় মহাসমরকে উপলক্ষ্য ক'রে বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটা জাগরণের সাড়া দিয়েছে। বাঙালী বিশ্বের দুয়ারে প্রমাণ করতে চায় যে সে শুধু তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন জাতি নয়--সে শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও সমরকুশলতায়ও অন্য কোন বীরজাতির অপেক্ষা হীন নয়।

স্বভাবতঃ বাঙালী রাজভক্ত প্রজা—সে মনে করে সাম্রাজ্য রক্ষার কাজ ব্রিটিশ সম্রাটের অন্যান্য প্রজাদের মত তারও কাজ। সেইজন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে এই আবেদন যে তাকেও সৈন্য বিভাগে **সকল শ্রেণীতে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা হোক।**

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে বাঙালীকে যে সামান্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, এবার যেন তার চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ দেওয়া হয়। বাঙালী তা'র ভীরুতার, অসামরিকত্বের গ্লানি নিঃশেষে ধুয়ে' ফেল্‌তে চায়।

গত মহাযুদ্ধে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, স্বর্গীয় লর্ড এস পি, সিংহ, ডাক্তার এস, কে, মল্লিক, কর্ণেল এস, পি, সর্ব্বাধিকারী, সার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী, অনারেবল্ ভূপেন্দ্র নাথ বোস, মিঃ বি, কে লাহিড়ী, পূজনীয়া সরলা দেবী চৌধুরাণী, পূজনীয়া শিশিরকুমারী মল্লিক প্রভৃতি বহু মহানুভব বাঙালী পুরুষ ও নারীর অক্লান্ত চেষ্টা, উৎসাহ ও সহযোগিতায় বাঙালীর ভাগ্যে সৈনিক হওয়ার যতটুকু সুযোগলাভ হয়েছিল, মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সে সেটুকু থেকে বঞ্চিত হ'ল। স্থায়ী বাঙালী পল্টন গঠন হ'লনা। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অল্পসংখ্যক
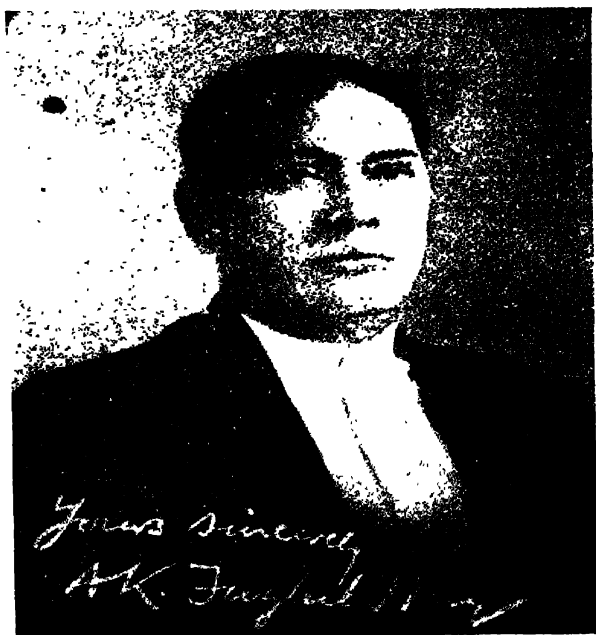
অনারেবল্ মিঃ এ, কে, ফজলুল হক ।

প্রাইম মিনিষ্টার, বেঙ্গল ।

বাঙালীকে নিয়ে একটি উপকূলরক্ষী গোলন্দাজ বাহিনী গঠনের প্রস্তাব মঞ্জুর করেছেন। এটা একটু সামান্য সুযোগ হলেও বাঙালীর পক্ষে আশার ও আনন্দের কথা। এখন এই সুযোগকে সফল করে তোলবার দায়িত্ব প্রত্যেক বাঙালী নরনারীর, বিশেষ ক'রে যে সকল বাঙালী যুবক এই গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান ক'রবেন, তাঁদের।

মাননীয় জঙ্গীলাট বাহাদুর ভারতবর্ষের সৈন্যসংখ্যা শীঘ্র বাড়ানো হ'বে বলে ঘোষণা করেছেন। আজ জঙ্গীলাট বাহাদুরের এই বাণী ভবিষ্যৎ বাংলার শুভলক্ষণ বলে বাংলার প্রত্যেক নেতাদের উপলব্ধি করা উচিত। জঙ্গীলাট বাহাদুরের এই বাণীর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেবার সঙ্গে আমি বাংলা দেশবাসী ও জাতীয় নেতাদের সকলকে সানুনয় অনুরোধ করছি তাঁরা যেন সাম্রাজ্যের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে মহামান্য সম্রাটবাহাদুরের সর্ব্বশ্রেণীর সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বে বাঙালী সৈন্যবাহিনীকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে উদ্যত এই যুদ্ধকে জয়যুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

প্রবাসী

সন ১৩৪৬ সাল, অগ্রহায়ণ।

সৈনিক বাঙালী—[49th Bengalee Regiment] ১৯১৬-১৯২০। সুবেদার শ্রীযুক্ত মন বাহাদুর সিংহ প্রণীত।

"মানুষ যদি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে সকল অবস্থায় অহিংস থাকিয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারে, তাহা অবশ্যই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মানব-সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধ না করিয়া যে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা যায়, হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করা যায়, স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় এবং অন্য কোন কোন অবস্থাতে বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে মান, ইজ্জৎ প্রভৃতি রক্ষা করা যায়, তাহা এখনও কার্য্যতঃ প্রমাণিত হয় নাই; তদ্ভিন্ন, ভীরুতা বা তদ্বিধ অন্য কারণে যে ব্যক্তি হিংসায় অসমর্থ, তাহার অহিংসতা অর্থহীন ও মূল্যহীন। এই জন্য সকল দেশের সকল জাতিরই যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য ও শিক্ষা থাকা আবশ্যক। গত মহাযুদ্ধে সাত হাজারের উপর বাঙালী যুদ্ধে যোগ দিয়া শুধু অতীত কালে নহে, বর্ত্তমানেও যে যুদ্ধ করিতে শিখিতে পারে এবং সাহস ও দক্ষতার জন্য প্রশংসিত হইত পারে, তাহা কার্য্যতঃ দেখাইয়া-ছিলেন। এই বইখানি পড়িলে তাহা বুঝা যায়। **ইহা প্রত্যেক পঠনক্ষম বাঙালীর পড়া উচিত। বর্ত্তমানে ইহার প্রকাশ খুব সময়োচিত হইয়াছে।**

আনন্দবাজার

কলিকাতা—২৯শে আশ্বিন, সোমবার।

১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধে বাঙালী পল্টন গঠন এবং তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস। ৪৯ সংখ্যক বাঙালী পল্টনের কাহিনী কৌতূহল উদ্রেক করে। লেখকের সরস রচনা ভঙ্গীর গুণে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

Hindusthan Standard.

Sunday, February 18, 1940.

SAINIK BANGALI (49th Bengali Regiment 1916-20)—By Subedar M. B. Singh.

The author of this book joined the first batch of the Bengali Regiment as a private, served through the Mesopotamian campaign and the Kurdistan expedition during the last Great War and immediately after it, and rose to the rank of a Subedar, the second highest rank then obtainable by an Indian soldier. He has in a pleasant style described his experience as a soldier and his narrative will clearly show that the Bengali is not lacking in military qualities.

The question of giving military training to Bengali youngmen has again cropped up at this moment; so we consider it as a timely publication and hope the book will be widely read, specially by youngmen.

S. K. G.

The Modern Review For December, 1939.

SAINIK BANGALI (49th Bengali Regiment) 1916-1920. By Subedar M. B. Sinha.

"This book describes the recruiting, training, achievements and experiences of the 49th Bengali Regiment during the last great war, after which it was disbanded. The author, who was one of those privates in the Regiment who rose to be commissioned officers, puts in a cogent plea in this attractively written book for recruiting Bengalis again and giving them a place in the standing army.

The book should be read not only by Bengalis but also by all those other Indians who are at present practically excluded from the army, though they all pay taxes for its maintenance and though their fellow-provincials of former generations fought as privates and officers in the Indian army."

It was a treat to go through the book "Sainik Bangali" (49th Bengalee Regiment) by Subedar M. B. Singh. Both by its exquisite diction and its marshalling of facts, the book kept me spell-bound, till I could come to its close, although, I must say, I was at times disappointed with the author's attempt at abridgement. The book should be kept in every Bengalee home.

The publication of the book just at the present moment, when the European nations have thrown themselves heart and soul into this bloody warfare, has been most opportune, specially because the book has made out a strong case, not only for the re-organisation of a new Bengalee Regiment at this time of the war, but also for the enlistment and inclusion of Bengalees into the standing army for India. The activities of the Bengalee Regiment in different arenas of war have further shewn that the Bengalees are, apart from their intellectual acumen, endowed with a sturdy constitution, which can cope with and suffer all manner of hardship and privations, which the life of a soldier has got to face with in his inordinate routine duties day in and day out. It cannot be ignored that every country in the world has got a standing army; and this must continue to be so, so long as the nations do not make up their mind to give up their present spirit of coercion among themselves in in their every day sphere of life and their mundane activities connected therewith. There can therefore be no earthly reason, why of all nations, Indian standing army should eliminate the Bengalees, more so, because they were able to establish once for all that their education and culture counted much more than mere brute force in the efficient performance of their arduous duties,

assigned to them. It is however an admitted fact that it is the half-educated, if not illiterate masses in the lowest stratum of society who make up most of the recruits in the army in every country ; and India has so far been no exception to this long standing practice, except in the case of Bengalees. It can be assumed that only educated men are likely to be warlike at ordinary times, since they are alone vividly aware of the part, which their own nation might play in the affairs of the world ; but as a great thinker has put it "it is only their knowledge, not their nature, that distinguishes them from their more ignorant compatriots." But knowing fully well that this distinguishing feature of life vanishes, no sooner war-fever seizes hold of people, there seems to be no reason why in the case of Bengal alone, uneducated masses should not constitute the major portion of the militia for the country. "Devotion to the nation itself is perhaps the deepest and most wide-spread religion of the present age." To convert that devotion into genuine patriotism, a nation must, apart from and above all other activities, know how to cultivate and rouse a warlike motivity among the people at large.

The author has placed the general public under a debt of gratitude by his timely and pertinent reference to the facts, stated above in the book ; and he will be more than repaid for his labours

if his countrymen will take the inspiration from his jotting and start a country-wide agitation for the satisfaction of their warlike cravings.

Yagananda Das.

খিদিরপুর, কলিকাতা
৩রা আগষ্ট—১৯৩৯।

ভাই মনবাহাদুর—

তুমি আমাদের পল্টনের (49th Bengalees) সম্বন্ধে "সৈনিক বাঙালী" নামক বই লিখছো শুনে খুব আনন্দিত হলাম। পল্টনের পুরাতন স্মৃতি তোমার বইএর পাতায় নবীন করে জাগিয়ে তুলে আমাদের যে আনন্দ দান করবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। নওশেরা ও করাচীর সম্বন্ধে আমার লেখা একখানা খাতা ও কতকগুলি ছবি যেমন "Bengali Double Coy" "Ladies Committe group," "Bayonet Fighting." "Musketry Practice" প্রভৃতি তোমাকে পাঠালাম, আমার মনে হয়—তোমার বই লিখ্‌তে এগুলি সাহায্য করবে। তোমাকে সানন্দে আমার লেখার অংশ ও ছবিগুলি তোমার "সৈনিক বাঙালী" বইএ ছাপাবার সম্মতি দিলাম।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন তোমার এই উদ্যম সফল হোক এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের উৎসাহ দান করুক। ইতি তোমার সৈনিক বন্ধু :—

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সেন।
(Ex-Subedur, 49th Bengalees)